Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজা গুরুত্ব ফজিলত ও প্রয়োজনীয় মাসলা মাসায়েল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবিনা ইয়াছমিন

রোলঃ 23090120478

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজা গুরুত্ব ফজিলত ও প্রয়োজনীয় মাসলা মাসায়েল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবিনা ইয়াছমিন

রোলঃ 23090120478

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " রোজা গুরুত্ব ফজিলত ও প্রয়োজনীয় মাসলা মাসায়েল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাবিনা ইয়াছমিন, আইডিঃ 23090120478 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " রোজা গুরুত্ব ফজিলত ও প্রয়োজনীয় মাসলা মাসায়েল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

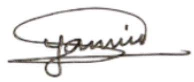

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সাবিনা ইয়াছমিন

আইডিঃ 23090120478

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা 7

১. বিষয় নির্বাচনের কারণ 7

২. গবেষণার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব** 9

৩. গবেষণার পদ্ধতি ও উৎস 11

রোযার পরিচয় ও সংজ্ঞা 14

রোযার ফরজ হওয়ার প্রমাণ 16

রোজার প্রকারভেদ : 17

রোজার রুকন 18

তৃতীয় অধ্যায়: রোযার ইতিহাস 21

রমযানের রোজা ফরয হওয়ার ইতিহাস 24

রমাযানের রোযায় মানুষের শ্রেণীভেদ 26

চতুর্থ অধ্যায়: রোযার গুরুত্ব ও ফজিলত 47

১. আত্মসংযম ও নৈতিক উন্নতি 59

২. আল্লাহর প্রতি ভরসা ও তাকওয়া বৃদ্ধি 59

৩. সামাজিক শিক্ষা ও সহানুভূতি 60

৪. স্বাস্থ্যগত উপকারিতা 60

পঞ্চম অধ্যায়: রোযার মাস'আলা-মাসায়েল (প্রচলিত বিষয়) 60

৬ষ্ঠ অধ্যায়-সেহরী ও ইফতারেরর বিধান 71

সেহরী বা সাহারী খাওয়া 71

রমযানের রোজায় দোয়া ও আমল 84

রোজায় বর্জনীয় 94

৭ম অধ্যায়-চিকিৎসা ও আধুনিক প্রসঙ্গ 96

আধুনিক ভ্রমণ ও বিমানযাত্রা 101

মিডিয়া ও প্রযুক্তির প্রভাব 103
উপসংহার ও সুপারিশ 106
গবেষণার সারসংক্ষেপ: 106
শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ 107
ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা 108

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

১. বিষয় নির্বাচনের কারণ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যার প্রতিটি বিধান মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত। এর মধ্যে রোযা এমন একটি ইবাদত, যা মানুষকে আত্মসংযম, ধৈর্য, ও তাকওয়ার পথে চালিত করে। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

> (সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)

> অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা পরহেজগার হও।"

রোজা ইসলামের একটি মৌলিক ফরজ ইবাদত, যা মুসলমানের জীবনের সর্বক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলে। এটি শুধুমাত্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণা থেকে বিরত থাকার নাম নয়; বরং আত্মশুদ্ধি, আত্মসংযম, আল্লাহভীতি এবং নৈতিক উন্নতির এক অনন্য মাধ্যম। রোজার মাধ্যমে মানুষ ধৈর্য, সহানুভূতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা লাভ করে, যা তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে।

এই থিসিসের বিষয় হিসেবে **"রোজা (সিয়াম)"** নির্বাচন করার মূল কারণ হলো—আধুনিক যুগে মানুষের জীবনে নৈতিক অবক্ষয়, ভোগবাদিতা, অসহিষ্ণুতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ নিজের ইচ্ছা, ভোগ ও স্বার্থকেন্দ্রিকতায় এমনভাবে নিমজ্জিত হচ্ছে যে, নৈতিকতা ও আত্মসংযমের গুরুত্ব ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ রোজা এমন একটি ইবাদত, যা মানুষকে সংযম, ধৈর্য, সততা, শৃঙ্খলা ও ন্যায়পরায়ণতার চর্চা শেখায়। তাই এই ইবাদতের অন্তর্নিহিত শিক্ষা ও সামাজিক প্রভাব নিয়ে গবেষণা করা সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে।

রোজার গুরুত্ব শুধু ধর্মীয় নয়; এর রয়েছে স্বাস্থ্য, সমাজ, অর্থনীতি ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাৎপর্য। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, রোজা দেহের বিপাক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে, শরীর থেকে ক্ষতিকর উপাদান দূর করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে রোজা মানসিক প্রশান্তি, আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করে। সামাজিকভাবে রোজা ধনী-গরিবের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি সৃষ্টি করে, যা সমাজে ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তি স্থাপন করে।

বর্তমান সমাজে যখন মানুষ পার্থিব জীবনের মোহে নৈতিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলছে, তখন রোজার শিক্ষা মানুষকে আবারও আত্মসচেতন, পরহেজগার ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। তাই ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক পুনর্জাগরণের জন্য রোজার দর্শন ও কার্যকারিতা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এছাড়া, ইসলামী ইবাদতের মধ্যে রোজা এমন এক অনুশীলন, যা মানবজীবনের সব দিক স্পর্শ করে— আত্মা থেকে শরীর, ব্যক্তি থেকে সমাজ, ধর্ম থেকে বিজ্ঞান পর্যন্ত। ফলে রোজাকে কেন্দ্র করে বহুমাত্রিক গবেষণার সুযোগ রয়েছে। যেমন— রোজার নৈতিক প্রভাব, রোজার স্বাস্থ্যগত উপকারিতা, রোজা ও সামাজিক সংহতি, রোজা ও পরিবেশ সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো এখনো পর্যাপ্তভাবে আলোচিত হয়নি। এই থিসিসের মাধ্যমে এসব দিককে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, রোজা এমন একটি ইবাদত যা প্রতিটি মুসলমানের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। কিন্তু অনেকেই রোজার প্রকৃত উদ্দেশ্য, শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে না। অনেক সময় রোজা শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হয়, অথচ এর নৈতিক ও আত্মিক শিক্ষা জীবনে প্রতিফলিত হয় না। তাই এই গবেষণার মাধ্যমে রোজার প্রকৃত উদ্দেশ্য, নৈতিক শিক্ষা ও সমাজে এর প্রয়োগিক দিকগুলো স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হবে।

অতএব, “রোজা” বিষয়টি নির্বাচন করার মূল উদ্দেশ্য হলো— ইসলামী ইবাদতের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটির আত্মিক, সামাজিক, নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য উদ্ভাসিত করা এবং তা বর্তমান যুগের মানুষ ও সমাজের কল্যাণে কীভাবে বাস্তবভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, তা অনুসন্ধান করা। আশা করা যায়, এই গবেষণা রোজার প্রতি মানুষের অনুরাগ বৃদ্ধি করবে, নৈতিকতা জাগ্রত করবে এবং ইসলামি জীবনব্যবস্থার সৌন্দর্য নতুনভাবে অনুধাবনে সহায়তা করবে, ইনশাআল্লাহ।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব**

১. গবেষণার উদ্দেশ্য**

রোজা ইসলামের একটি মৌলিক ফরজ ইবাদত, যার উদ্দেশ্য শুধু ক্ষুধা ও তৃষ্ণা থেকে বিরত থাকা নয়; বরং আল্লাহভীতি, আত্মসংযম, নৈতিকতা ও মানবিকতা অর্জন করা। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো রোজার এই বহুমাত্রিক দিকগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা, যাতে রোজা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবধর্মী ধারণা পাওয়া যায়।

এই গবেষণার মাধ্যমে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের চেষ্টা করা হয়েছে—

১. রোজার প্রকৃত অর্থ, উদ্দেশ্য ও দর্শন বিশ্লেষণ করা, যাতে বোঝা যায় ইসলাম রোজার মাধ্যমে কী শিক্ষা দিতে চায়।

২. কুরআন ও হাদীসের আলোকে রোজার বিধান, তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা।

৩. রোজা মানুষের নৈতিক ও আত্মিক জীবনে কী প্রভাব ফেলে তা অনুসন্ধান করা।

৪. রোজা ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা— অর্থাৎ রোজা কিভাবে সমাজে সহমর্মিতা, দানশীলতা ও সমতা সৃষ্টি করে তা উদঘাটন করা।

৫. আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে রোজার স্বাস্থ্যগত ও মনস্তাত্ত্বিক উপকারিতা বিশ্লেষণ করা।

৬. রোজার মাধ্যমে কীভাবে বর্তমান সমাজে নৈতিকতা, ধৈর্য, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ন্যায়ের মূল্যবোধ জাগ্রত করা যায় তা তুলে ধরা।

৭. রোজার শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগের উপায় ও চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা।

৮. প্রচলিত রোযার মাস'আলা-মাসায়েলগুলো পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করা।

৯.আধুনিক যুগে উদ্ভূত নতুন মাস'আলাগুলোর (যেমন ইনজেকশন, রক্ত পরীক্ষা, ইনসুলিন, ভ্রমণ ইত্যাদি) শরঈ অবস্থান নির্ধারণ করা।

১০.রোজার ওপর ভবিষ্যৎ গবেষণার নতুন নতুন দিক নির্দেশ করা, যাতে ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি হয়।

এই গবেষণার মাধ্যমে রোজাকে শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় অনুশাসন হিসেবে নয়, বরং মানবজীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের একটি পথ হিসেবে উপস্থাপন করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

২. গবেষণার গুরুত্ব

রোজা ইসলামী জীবনব্যবস্থার এমন একটি অংশ, যা মানবজীবনের প্রতিটি স্তরে প্রভাব বিস্তার করে— ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পর্যন্ত। বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী নৈতিক অবক্ষয়, আত্মকেন্দ্রিকতা, অশান্তি ও অসহিষ্ণুতার যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, সেখানে রোজার শিক্ষা সমাজে ভারসাম্য, সহনশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

এই গবেষণার গুরুত্ব কয়েকটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—

ক. ধর্মীয় দিক থেকে

রোজা ইসলামের অন্যতম ফরজ বিধান। তাই এই ইবাদতের প্রকৃত উদ্দেশ্য, শিক্ষা ও উপকারিতা সম্পর্কে গভীরভাবে জানা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। গবেষণাটি কুরআন ও হাদীসের আলোকে রোজার মূল ভাব ও তাৎপর্য স্পষ্ট করবে, যা ধর্মীয় জ্ঞানের বিস্তারে সহায়ক হবে।

খ. নৈতিক ও আত্মিক দিক থেকে

মানুষ যখন ভোগবাদ, অসহিষ্ণুতা ও নৈতিক শৈথিল্যে আক্রান্ত, তখন রোজার শিক্ষা মানুষকে আত্মসংযম, ধৈর্য ও তাকওয়ার পথে ফিরিয়ে আনে। এই গবেষণার মাধ্যমে রোজার নৈতিক শিক্ষা কীভাবে ব্যক্তিজীবন ও সমাজে বাস্তবভাবে প্রয়োগ করা যায়, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

গ. সামাজিক দিক থেকে

রোজা সমাজে দানশীলতা, সহমর্মিতা ও সমবণ্টনের মানসিকতা তৈরি করে। এই গবেষণা সমাজে দরিদ্র ও বিত্তবানদের সম্পর্ক, রমজান মাসে দান ও সামাজিক সংহতির ভূমিকা এবং রোজার সামাজিক প্রভাবের ওপর আলোকপাত করবে।

ঘ. স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞানভিত্তিক দিক থেকে

রোজা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক নয়, বৈজ্ঞানিকভাবেও উপকারী। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে দেখা গেছে, রোজা শরীরের বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে, রক্তচাপ ও শর্করার মাত্রা

স্থিতিশীল রাখে এবং মানসিক প্রশান্তি আনে। এই গবেষণার মাধ্যমে রোজার বৈজ্ঞানিক ও স্বাস্থ্যগত গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হবে।

ঙ. শিক্ষাগত ও মানবিক দিক থেকে

শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন, ধৈর্য ও শৃঙ্খলা রোজার মাধ্যমে বিকশিত হয়। এই গবেষণা তরুণ প্রজন্মের মাঝে রোজার প্রকৃত শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরবে।

চ. সমসাময়িক সমাজে প্রয়োগযোগ্যতা

আজকের প্রযুক্তিনির্ভর ব্যস্ত জীবনে রোজার শিক্ষা মানুষকে সংযম, সময়ানুবর্তিতা ও ভারসাম্যের শিক্ষা দেয়। এই গবেষণা দেখাবে, আধুনিক সমাজে রোজার নৈতিক শিক্ষা কিভাবে মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে।

এই গবেষণার গুরুত্ব হলো— এটি শুধু ফিকহি জ্ঞান বাড়াবে না, বরং রোযাকে সঠিকভাবে পালন করার বাস্তব দিকগুলোও পরিষ্কার করবে। পাশাপাশি আধুনিক চিকিৎসা ও প্রযুক্তিগত জটিলতার মধ্যে রোযার বিধান কেমনভাবে প্রযোজ্য হবে, তাও এই গবেষণায় ব্যাখ্যা করা হবে।

৩. গবেষণার পদ্ধতি ও উৎস

১. গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণগত (Qualitative) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কারণ রোজা বিষয়টি একটি ধর্মীয় ও নৈতিক বিষয়, যার বিশ্লেষণ প্রামাণ্য ধর্মীয় উৎস, ঐতিহাসিক তথ্য ও সমাজ-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়েছে—

১. বিবরণমূলক বিশ্লেষণ (Descriptive Analysis):

রোজার সংজ্ঞা, বিধান, ইতিহাস ও তাৎপর্য সম্পর্কে কুরআন, হাদীস ও প্রাচীন ইসলামী গ্রন্থের ভিত্তিতে বিশদ বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি (Analytical Method):
রোজার আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে যুক্তিনির্ভরভাবে, যাতে বিষয়টির সার্বিক উপলব্ধি পাওয়া যায়।

৩.তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method):
রোজার সঙ্গে অন্যান্য ধর্মে প্রচলিত উপবাস বা ফাস্টিং প্রথার তুলনা করা হয়েছে, যাতে ইসলামী রোজার বিশেষত্ব ও সার্বজনীনতা নিরূপণ করা যায়।

৪. আধুনিক গবেষণার সমন্বয় (Integrative Approach):
আধুনিক চিকিৎসা, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের তথ্য ও মতামত সংগ্রহ করে রোজার বহুমাত্রিক প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে।

৫. নিরপেক্ষ ও তথ্যভিত্তিক উপস্থাপন:
গবেষণায় ব্যক্তিগত মতামতের পরিবর্তে প্রামাণ্য উৎস, উদ্ধৃতি ও তথ্যের ভিত্তিতে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা বজায় থাকে।
এই পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে রোজার ধর্মীয় দিক, বাস্তব প্রয়োগ ও মানবিক উপকারিতা একত্রে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাতেরোজার পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করা যায়।

২. তথ্য ও উপাদানের উৎস
এই গবেষণায় প্রাথমিক (Primary) ও গৌণ (Secondary) উভয় ধরনের উৎস ব্যবহার করা হয়েছে।

ক. প্রাথমিক উৎস (Primary Sources):
১. পবিত্র কুরআন:রোজা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ যেমন— সূরা আল-বাকারা (আয়াত ১৮৩–১৮৭) এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আয়াত অধ্যয়ন করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
২. হাদীস শরীফ: সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনান আবু দাউদ, তিরমিযি প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত রোজা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
৩. ফিকহ ও তাফসীর গ্রন্থ:ইমাম নববী, ইবনে কাসীর, আল-কুরতুবী তাহযীবুল উম্মাহ,লিসানুল আরব,তারিফাত লিল জুরজানিি‍আল বিনায়া শরহে হিদায়া,তাহযীবুল

লুগাহ,হাশিয়ায়ে ফাতাওয়া দারুল উলুম,আল কামুসুল ফিকহি,তাফসীরে কুরতুবী,মাজমুউল ফাতাওয়া।আশশারহুল মুমতে’, ফুসূলুন ফিস্-সিয়ামি অত্-তারাবীহি অয্-যাকাহ,সাবঊনা মাসআলাহ ফিস্-সিয়াম,
ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ , ইরওয়াউল গালীল, আলবানী এছাড়াও আলেমদের ব্যাখ্যা ও মতামত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

খ. গৌণ উৎস (Secondary Sources):

১. আধুনিক ইসলামী সাহিত্য: রোজার তাৎপর্য, নৈতিকতা ও সামাজিক প্রভাব নিয়ে রচিত সমসাময়িক লেখকদের বই, গবেষণাপত্র ও প্রবন্ধ।

২. স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা:রোজার শারীরিক ও মানসিক উপকারিতা বিষয়ক মেডিকেল জার্নাল, গবেষণা প্রতিবেদন ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

৩. সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতিবিষয়ক সূত্র: সমাজে রোজার প্রভাব, দান ও সহমর্মিতা বিষয়ক আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

৪. অনলাইন ও ডিজিটাল উৎস:ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার,দ্য ন্যাশনাল ও হালাল টাইমস, আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মদিনা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত অনলাইন গবেষণা প্রতিবেদন।

সব তথ্য সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করে নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে সংগৃহীত হয়েছে, যাতে গবেষণার বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা বজায় থাকে।

তবুও যথাসম্ভব নির্ভুল ও যুক্তিনির্ভর তথ্য উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে, রোজা বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করতে পারেন।

এই গবেষণার পদ্ধতি ও উৎস নির্ধারণে প্রমাণভিত্তিক বিশ্লেষণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক ও আধুনিক উৎসের সমন্বয়ের মাধ্যমে রোজার ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক দিক উন্মোচিত করা হয়েছে। ফলে এই গবেষণা ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধ, বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একটি অর্থবহ অবদান রাখতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

রোযার পরিচয় ও সংজ্ঞা

১. রোযা শব্দের ভাষাগত ও পরিভাষাগত অর্থ

(ক) ভাষাগত অর্থ:

সাওম (الصَّوْمُ) শব্দটি আরবী, একবচন, এর বহু বচন হলো (الصِّيَام) সাওম। সাওম পালনকারীকে 'সায়েম' বলা হয়। ফার্সিতে বলা হয় রোযা এবং রোযা পালনকারীকে বলা হয় রোযাদার। এর শাব্দিক অর্থ হলো, পানাহার ও নির্জনবাস থেকে বিরত থাকা। আরবি অভিধান "লিসানুল আরব"-এ বলা হয়েছে:

الصَّوْمُ في اللغة: الإِمْسَاكُ عن الشيء.

অর্থ: "সওম অর্থ কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা।"

অভিধানে শব্দটির অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

الصَّوْمُ فِي اللُّغَة: الإمساكُ عَن الشيءِ والتَّرْكُ لَهُ. وَقيل للصائمِ صَائِم: لإمساكه عَن الْمطعم وَالْمشْرَب والمنكح.

"কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা, সাওম পালনকারীকে 'সায়েম' বলা হয় এজন্য যে, সে খাদ্য, পানীয় ও জৈবিক চাহিদা থেকে বিরত থেকেছে।"

وَقيل للصامت: صَائِم، لإمساكه عَن الْكَلَام. وَقيل للفرسِ: صَائِم، لإمساكه عَن العَلَف مَعَ قِيَامه.

"চুপ থাকা ব্যক্তিকে 'সায়েম' বলা হয়, কেননা সে কথা বলা থেকে বিরত থেকেছে। এমনিভাবে যে ঘোড়া খাদ্য খাওয়া থেকে বিরত রয়েছে তাকেও 'সায়েম' বলা হয়।"

ইবন 'আরাবী রহ. বলেছেন,

وصامَ الرجلُ: إِذا تَظَلَّلَ بالصَّوْم، وَهُوَ شجر؛ قالهُ ابْن الأَعرَابِي.

"কোনো ব্যক্তি যখন গাছের নিচে ছায়া নিচ্ছে তাকে বলা হয় 'সমার রজুল।"
(লোকটি ছায়ায় থেকে চলাফেরা থেকে বিরত থেকেছে)।

লাইস রহ. বলেছেন,

الصَّوْمُ: تَرْكُ الْأكل وتَرْكُ الْكَلَام.

"সাওম হলো খাদ্য ও কথা বলা থেকে বিরত থাকা।" যেমন কুরআনে এসেছে,

﴿فَكُلِي وَٱشۡرَبِي وَقَرِّي عَيۡنٗاۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلۡبَشَرِ أَحَدٗا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرۡتُ لِلرَّحۡمَٰنِ صَوۡمٗا فَلَنۡ أُكَلِّمَ ٱلۡيَوۡمَ إِنسِيّٗا ٢٦﴾ [مريم: ٢٦]

"অতঃপর তুমি খাও, পান কর এবং চোখ জুড়াও। আর যদি তুমি কোনো লোককে দেখতে পাও তাহলে বলে দিও, 'আমি পরম করুণাময়ের জন্য চুপ থাকার মানত

করেছি। অতএব, আজ আমি কোনো মানুষের সাথে কিছুতেই কথা বলব না।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ২৬]

وَصَامَ الفَرَس على آرِيِّه: إذا لم يَعْتَلِف. والصومُ: قِيَامٌ بِلَا عَمل. وصامَتِ الرِّيحُ: إذا رَكَدَتْ.

“ঘোড়া যখন খাদ্য খাওয়া থেকে বিরত থাকে তাকে বলা হয় ‘সমাল ফারাস’, আবার সাওম অর্থ কোনো কাজ না করা। বলা হয়, ‘সমাতির রিহ’ বাতাস যখন থেমে থাকে।”

সুফিয়ান ইবন ‘উয়াইনাহ রহ. বলেছেন,

الصَّوْمُ هُو الصَّبْرُ، يَصْبِرُ الإنسانُ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالنِّكَاحِ، ثُمَّ قَرَأَ: إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ.

“সাওম অর্থ ধৈর্য। কেননা মানুষ খাদ্য, পানীয় ও স্ত্রী সহবাস থেকে ধৈর্য ধারণ করে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পড়েন,

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجۡرَهُم بِغَيۡرِ حِسَابٖ ١٠﴾ [الزمر: ١٠]

“কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেওয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়াই”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১০] *তাহযীবুল লুগাহ ১২/১৮২, লিসানুল ‘আরব: ১২/৩৫০।*

(খ) পরিভাষাগত অর্থ (শরঈ সংজ্ঞা):

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়,

‘’ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্য, পানীয় ও যৌনাচার ইত্যাদি থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিরত থাকা—এটাই রোযা।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন:

*هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

অর্থ: “ফজরের সূচনালগ্ন থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা ভঙ্গকারী কাজ থেকে নিয়তের সঙ্গে বিরত থাকাকে রোযা বলা হয়।”

আল-কামুসুল ফিকহি গ্রন্থে বলা হয়েছে,

الصوم هو إمساك عن المفطرات، حقيقة، أو حكما، في وقت مخصوص، من شخص مخصوص، مع النية.

وقيل: الصوم هو إمساك المكلف بالنية من الليل من تناول المطعم.

“সাওম হলো, নির্দিষ্ট সময় সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী থেকে নিয়তসহ সাওম ভঙ্গকারী হাকীকী ও হুকমী (খাওয়া, পান করা এবং যৌনসম্ভোগ) বিষয় থেকে বিরত থাকা।” *আল-কামুসুল ফিকহি, পৃ: ৩৫০।*

কারও কারও মতে, ‘সাওম হচ্ছে মুকাল্লাফ তথা শরী‘আতের নির্দেশনা প্রযোজ্য এমন লোকের পক্ষ থেকে নিয়তসহ রাত থেকে খাবার-পানীয় থেকে বিরত থাকা।

যুরযানী রহ. বলনে,

عبارة عن إمساك مخصوص وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى المغرب مع النية.

“সুবহে সাদিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ এবং যৌনাচার থেকে নিয়তের সাথে বিরত থকার নাম হলো সাওম।” *তা‘রিফাত লিল জুরজানী, পৃ: ১৭৮।*

বদরুদ্দীন ‘আইনী রহ. বলেন,

الصوم هو الإمساك عن المفطرات الثلاثة نهاراً مع النية.

“খাওয়া, পান করা এবং যৌনসম্ভোগ -এ তিনটি কাজ থেকে নিয়তসহ বিরত থাকার নাম হলো সাওম।” *আল বিনায়া শরহে হিদায়া, ৪/৩।*

শরী‘আতের দৃষ্টিতে সুবহে সাদিক থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার,যৌন সম্ভোগ ও শরী‘আত নির্ধারিত বিধি-নিষেধ থেকে নিয়তসহ বিরত থাকাকে সাওম বলে। শরী‘আতে ঈমান,সালাত ও যাকাতের পরেই সাওমের স্থান। যা ইসলামের চতুর্থ রুকন।

রোযার ফরজ হওয়ার প্রমাণ

ইসলামে রোযার ফরজ হওয়ার প্রমাণ

রোযা শুধুমাত্র সুন্নত ইবাদত নয়, বরং এটি ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি মৌলিক ফরজ ইবাদত। কুরআন ও হাদীস উভয়েই এর ফরজ হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

(ক) কুরআনের আয়াতসমূহ:

1. সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৩:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ<

> অর্থ: “হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা পরহেজগার হও।”

2. সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৫:

* >شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ*

> অর্থ: “রমজান মাস, যখন কুরআন নাজিল করা হয়েছে, তা মানুষের জন্য হিদায়ত ও সত্য-বিভাজনের দিক নির্দেশক।”

> এই আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে যে রোযা ফরজ এবং এটি মানুষকে তাকওয়া অর্জনে সাহায্য করে।

(খ) হাদীসের প্রমাণ:

নবী করিম ﷺ বলেন:

* >من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه*

> অর্থ: “যে ব্যক্তি ইমান ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রমজান মাস রোযা পালন করবে, তার পূর্বের সমস্ত পাপ মাফ হয়ে যাবে।”

> এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে রোযা শুধু খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকা নয়, বরং এটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পরিশুদ্ধির একটি মাধ্যম।

রোজার প্রকারভেদ :

চার প্রকার। যথা ১. ফরজ, ২. নফল, ৩. মাকরূহ ৪. হারাম।

প্রথমত : ফরয রোজা :

(ক) রমযান মাসের রোজা

(খ) কাযা রোজা

(গ) কাফফারার রোজা

(ঘ) মান্নত রোজা

দ্বিতীয়ত : নফল রোজা

(ক) শাওয়াল মাসের ছয়টি রোজা

(খ) যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকের রোজা

(গ) আরাফাতের দিনের রোজা

(ঘ) মুহাররম মাসের রোজা

(ঙ) আশুরার রোজা

(চ) প্রতি চন্দ্রমাসের ১৩. ১৪, ১৫- এ তিন দিনের রোজা

(ছ) সাপ্তাহিক সোম ও বৃহস্পতিবারের রোজা

(জ) শাবান মাসের রোজা

(ঝ) দাউদ (আঃ)’র রোজা

(ঞ) বিবাহে অসামর্থ ব্যক্তিদের রোজা।

তৃতীয়ত : মাকরূহ রোজা

(ক) হাজ্জ পালনরত অবস্থায় আরাফাতের দিনের রোজা

(খ) বিরতীহীনভাবে রোজা পালন

(গ) পানাহার বিহীন রোজা

(ঘ) কেবলমাত্র জুমুআর দিনের রোজা

(ঙ) শুধুমাত্র শনিবারে রোজা

চতুর্থত : হারাম রোজা :

(ক) দু' ঈদের দিন এবং কুরবানীর ঈদের পরবর্তী ৩ দিন

(খ) সন্দেহ পূর্ণ দিনের (৩০শে শাবান) রোজা

(গ) স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর নফল রোজা

(ঘ) মহিলাদের হায়েয নিফাসকালীন সময়ের রোজা

(ঙ) গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় রোজা।

রোজার রুকন

রোজা**র দুটি রুকন;** যদ্দবারা তার প্রকৃতত্ব সংগঠিতঃ-

১। ফজর উদয় হওয়ার পর থেকে নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময় ধরে যাবতীয় রোযা নষ্টকারী জিনিস থেকে বিরত থাকা। মহান আল্লাহ বলেন,

(وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)

অর্থাৎ, আর তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না কালো সুতা থেকে ফজরের সাদা সুতা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে। অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। *(কুরআনুল কারীম ২/১৮৭)*

উক্ত আয়াতে উল্লেখিত কালো সুতা ও সাদা সুতা বলে রাতের অন্ধকার ও দিনের শুভ্রতাকে বুঝানো হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে আদী বিন হাতেম কর্তৃক বর্ণিত, উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি (মাথায় রুমালের উপর ব্যবহার্য) একটি সাদা ও একটি কালো মোটা রশি (বালিশের নিচে) রাখলেন। রাত্রি হলে তিনি লক্ষ্য করলেন, কিন্তু (কোন্টা সাদা ও কোন্টা কালো) তা স্পষ্ট হল না। সকাল হলে তিনি এ কথা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে উল্লেখ করলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বললেন, "তোমার বালিশ তাহলে খুবই বিশাল! কালো

সুতা ও সাদা সুতা তোমার বালিশের নিচে ছিল?!' অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তার মানে হল, রাতের অন্ধকার ও দিনের শুভ্রতা।"

২। **নিয়ত** ; আর তা হল, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করার উদ্দেশ্যে রোযা রাখার জন্য হৃদয়ের সংকল্প। আল্লাহ বলেন,

(وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ)

অর্থাৎ, তারা তো আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছিল। *(কুরআনুল কারীম ৯৮/৫)*

আর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, "সমস্ত কর্ম নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং মানুষের তাই প্রাপ্য হয় যার সে নিয়ত করে।"বুখারি-১

সুতরাং যে ব্যক্তি ফরয (যেমন রমাযান, কাযা, নযর অথবা কাফ্ফারার) রোযা রাখবে, সে ব্যক্তির জন্য নিয়ত ও সংকল্প করা ওয়াজেব। আর নিয়ত হল, হৃদয়ের কাজ; তার সাথে মুখের কোন সম্পর্ক নেই। তার প্রকৃতত্ব হল, মহান আল্লাহর আদেশ পালন এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যে কোন কাজের সংকল্প করা। বলা বাহুল্য, 'নাওয়াইতু আন আসূমা গাদাম মিন শাহরি রামাযান' বলে নিয়ত পড়া বিদআত।

নিয়ত সংক্রন্ত মাসলা-মাসায়েল

০১. রমজানের প্রতিদিনই রোজার নিয়ত করতে হবে। এক দিন নিয়ত করলে পুরো রমজানের জন্য তা যথেষ্ট নয়। (সূত্র : ইলমুল ফিকাহ, খ- ৩, পৃষ্ঠা ১৮)।

০২. রাতেই নিয়ত করা আবশ্যক নয়, করে ফেললে ভালো। নিয়ত করার বিষয়টি মনে না থাকলে সকালে যখন মনে হবে, তখনই নিয়ত করে নিলেও তা হয়ে যাবে। তবে সেহরির সময় পার হয়ে যাওয়ার পর কোনো কিছু পানাহার করলে বা রোজা ভঙ্গের কোনো কারণ সংঘটিত হওয়ার পর নিয়ত করলে তা আদায় হবে না। (সূত্র : বেহেশতি-জেওর,খ-৩,পৃষ্ঠা৩)।

০৩. রমজানুল মোবারকে মনে মনে শুধু এটুকু ভাবলেই নিয়ত হয়ে যাবে যে আমি আজ রোজা রাখব। নির্দিষ্টভাবে কোনো দোয়া পাঠ করা বা আমি আজ রমজানের ফরজ রোজা রাখছি- এমন কিছু বলা জরুরি নয়। (সূত্র : বেহেশতি জেওর, খ- ৩, পৃষ্ঠা ৩)।

০৪. নফল রোজা, নির্দিষ্ট মানতের রোজা এবং রমজানের রোজাসমূহের নিয়ত রাতের বেলা অথবা শরিয়তের ঘোষিত অর্ধদিবস পর্যন্ত করা যাবে। অন্য সব ধরনের

রোজার জন্যই রাতের মধ্যেই নিয়ত করে নেওয়া জরুরি। (সূত্র : ফাতাওয়া দারুল উলুম, খ- ৬, পৃষ্ঠা ৩ ৪৬)।

০৫. রমজান মাসে সেহরি খাওয়াটাও রোজার নিয়ত বলে গণ্য হবে। তবে সেহরি খাওয়ার সময় রোজা রাখার ইচ্ছা না থাকলে তা নিয়তবলে গণ্য হবে না। (সূত্র : কিতাবুল ফিকাহ, খ- ১, পৃষ্ঠা ৮৮১)।

০৬. কোনো ব্যক্তি সারা দিন কিছুই পানাহার করেনি, রোজা ভাঙার কোনো কাজও তার মাধ্যমে সংঘটিত হয়নি; অথচ তার মনে রোজার রাখার কোনো ইচ্ছা ছিল না। হয়তো তার ক্ষুধাই লাগেনি বা তেমন কিছু করার প্রয়োজন হয়নি। এমন অবস্থায় তা রোজা বলে গণ্য হবে না। তবে মনে মনে রোজা পালনের ইচ্ছা করে থাকলে তা রোজা হয়ে যেত। (সূত্র : বেহেশতি জেওর, খ- ৩, পৃষ্ঠা ৩)।

০৭. ইসলামী শরিয়ার আলোকে রোজা শুরু হয় সুবহে সাদিক হতে। তাই সুবহে সাদিক উদয় না হওয়া পর্যন্ত পানাহারে কোনো আপত্তি নেই। সব কিছুই তখন বৈধ। অনেকে রাতের শুরুতে বা মাঝামাঝি সময়ে সেহরি খেয়ে শুয়ে পড়েন এবং মনে করেন, রোজার নিয়ত করার পর বা সেহরি খেয়ে ফেলার পর আর কিছু পানাহার করা যাবে না। এমন ধারণা সঠিক নয়। সুবহে সাদিক উদয় না হওয়া পর্যন্ত পানাহার করতে কোনো দোষ নেই। তা নিয়ত করা হোক বা না হোক। (সূত্র : বেহেশতি জেওর, খ- ৩, পৃষ্ঠা ৩)।

০৮. মনের ইচ্ছার নামই নিয়ত। সুনির্দিষ্টভাবে বিশেষ কোনো বাক্য মুখে উচ্চারণ করা জরুরি নয়। তাই রাতের বেলায় মনে মনে রোজা রাখার ইচ্ছা নিয়ে শুয়ে পড়লে তার জন্য ফের নিয়ত করার প্রয়োজন নেই। (সূত্র : হাশিয়ায়ে ফাতাওয়া দারুল উলুম, খ- ৬, পৃষ্ঠা ৪৪৬)।

০৯.মনে মনে নিয়ত করাই যথেষ্ট,

১০. দিনের দ্বিপ্রহরের আগে রোজার নিয়ত করা না হয়ে থাকলে সেই রোজা সহিহ হবে না। এর পরও রোজাহীন অবস্থায় দিনের বাকি সময়ে পানাহার করা রমজানুল মোবারকের সম্মানের বিরোধী বলে তা জায়েজ নয়। (সূত্র : ইমদাদুল ফাতাওয়া, খ- ১, পৃষ্ঠা ১৭৩)।

তৃতীয় অধ্যায়: রোযার ইতিহাস

রোযা ইসলামে নতুন নয়; এটি পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ) সকলের উম্মতদের মধ্যে খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকার ইবাদতের রীতি ছিল।

রোজা শুধু উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য ফরজ নয়; বরং অতীত নবি-রাসুলদের উম্মতদের জন্যও রোজা ফরজ ছিল। যদিও এর সময়, নিয়ম-পদ্ধতি ও ধারায় অনেক ভিন্নতা ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣﴾ [البقرة: ١٨٣]

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সাওম ফরয করা হয়েছে। যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩]

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল 'সাওম' বা রোযা নামের এই ধর্মানুষ্ঠান।

তাফসীরে কুরতুবীতে উক্ত আয়াতের ব্যাখায় বলা হয়েছে,

الْمَعْنَى:كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِيَامُ أَيْ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَهُمُ الْيَهُودُ- فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ- ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ. ثُمَّ نُسِخَ هَذَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بِشَهْرِ رَمَضَانَ. وَقَالَ مُعَاذُ بن جبل: نسخ ذلك ب أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ ثُمَّ نُسِخَتِ الْأَيَّامُ بِرَمَضَانَ.

"আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মতে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রত্যেক মাসে তিন দিন ও আশুরার দিনে সাওম ফরয ছিল, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের ওপর মাসে তিন দিন ও 'আশুরার দিনে সাওম ফরয ছিল। পরবর্তীতে রমযান মাসের দ্বারা এ সাওম রহিত হয়। মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, উক্ত তিন দিনের সাওম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের সাওমের দ্বারা রহিত হয়। অতঃপর উক্ত কয়েক দিনের সাওম আবার রমযানের সাওম দ্বারা রহিত হয়। *তাফসীরে কুরতবী: ২/২৭৫।*

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ»، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আশুরার দিন সাওম পালন করেছেন এবং এ সিয়ামের জন্য আদেশও পালন করেছে। পরে যখন রমযানের সাওম ফরয হলো তখন তা ছেড়ে দেওয়া হয়। ‘আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এ সাওম পালিন করতেন না, তবে মাসের যে দিনগুলোতে সাধারন সাওম পালন করতেন, তাঁর সাথে মিল হলে করতেন।*সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৯২।*

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ»

“জাহেলী যুগে কুরাইশগন ‘আশুরার দিন সাওম পালন করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পরে এ সাওম পালনের নির্দেশ দেন। অবশেষে রমযানের সাওম ফরয হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার ইচ্ছা ‘আশুরার সাওম পালন করবে এবং যার ইচ্ছা সে সাওম পালন করবে না।” *সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৯৩।*

আমরা এখানে আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত বিভিন্ন আসমানী ধর্মে ও মানব রচিত অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের যুগে যুগে সাওমের বিধান ও ধরণ নিয়ে আলোচনা করব।

হজরত আদম (আ.)-এর রোজা: প্রথম নবি আদম (আ.)-এর ধর্মে রোজার বিধান দেওয়া হয়েছিল বলে তাফসির গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য সেই রোজার ধরন ও প্রকৃতি কেমন ছিল, তা জানা যায় না। এ বিষয়ে বাইবেল, কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদিসের কিতাবেও কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে কেউ কেউ বলেছেন, আগের যুগের প্রত্যেক নবির শরিয়তেই চন্দ্রমাসের **১৩, ১৪** ও **১৫** তারিখে রোজা রাখার বিধান ছিল।

হজরত নুহ (আ.)-এর রোজা: তাফসীরে ইবন কাসীরে এসেছে,

قَدْ كَانَ هَذَا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ يَصُومُونَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الصِّيَامَ كَانَ أَوَّلًا كَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْأُمَمُ قَبْلَنَا، مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ -عَنْ مُعَاذٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ، وَقَتَادَةَ، وَالضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ. وَزَادَ: لَمْ يَزَلْ هَذَا مَشْرُوعًا مِنْ زَمَانِ نُوحٍ إِلَى أَنْ نَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ بِصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

“প্রসিদ্ধ তাফসীরবিদ মু‘য়ায, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ, ‘আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, ‘আতা, কাতাদা ও দাহহাক রহ. বর্ণনা করেন, নূহ আলাইহিস সালাম হতে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর যুগেই প্রতি মাসে তিনটি করে সিয়ামের বিধান ছিল। পরবর্তীতে ইহা রমযানের সাওম দ্বারা রহিত হয়। *তাফসীরে ইবনে কাসীর: (১/৪৯৭), তাফসীরে কুরতবীঃ (২/২৭৫), তাফসীরে ত্বাবারীঃ (৩/৪১১), তাফসীরে মানারঃ (২/১১৬।*

আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «صَامَ نُوحٌ الدَّهْرَ، إِلَّا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى»

“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নূহ আলাইহিস সালাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন বাদে সারা বছর সাওম পালন করতেন।” *ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৭১৪, আলবানী রহ. বলেছেন হাদীসটি দ‘য়ীফ। কেননা এর সনদে ابن لهيعة রয়েছেন, যিনি দ‘য়ীফ।*

হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর রোজা: মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহিম (আ.)-এর যুগে ৩০টি রোজা ছিল বলে কেউ কেউ লিখেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, ইবরাহিম (আ.)-এর ওপর প্রতি রমজানের প্রথম তারিখ সহিফা অবতীর্ণ হয়। এ জন্য তিনি রমজানের এক তারিখ রোজা রাখতেন। তাঁর অনুসারীদের জন্য ১, ২ ও ৩ রমজান রোজা রাখা ফরজ ছিল। এ ছাড়া নমরুদের অগ্নিকুণ্ড থেকে মুক্তির স্মরণে ১০ মুহাররম তাঁর উম্মতের জন্য রোজা রাখা ফরজ ছিল। আর কোরবানির স্মরণে ১১, ১২ ও ১৩ জিলহজসহ মোট সাত দিন ইবরাহিম, ইসমাইল ও ইসহাক (আ.)-এর উম্মতের জন্য রোজা ফরজ ছিল।

হজরত দাউদ (আ.)-এর রোজা: আসমানি কিতাব জবুরপ্রাপ্ত নবি দাউদ (আ.)-এর সময়ও রোজার প্রচলন ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় রোজা দাউদ (আ.)-এর রোজা। তিনি একদিন রোজা রাখতেন আর একদিন খেতেন।’ (সহিহ মুসলিম : ১১৫৯) অর্থাৎ, দাউদ (আ.) বছরে মোট ছয় মাস (একদিন পরপর) রোজা রাখতেন।

হজরত মুসা (আ.)-এর রোজা: আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত; রাসুল (সা.) মদিনায় হিজরত করে ইয়াহুদিদের আশুরার দিনে রোজা রাখতে দেখলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘আজ তোমরা কীসের রোজা রাখছ?’ তারা বলল,

‘এটা সেই মহান দিন, যেদিন আল্লাহতায়ালা মুসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়কে বনি ইসরাইল তথা ফেরাউনের কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন। ফলে শুকরিয়াস্বরূপ মুসা (আ.) ওই দিনে রোজা রেখেছিলেন। তাই আমরাও তাঁর অনুসরণে এদিন রোজা রাখি।’ এ কথা শুনে রাসুল (সা.) বললেন, ‘আমি তোমাদের চেয়ে মুসা (আ.)-এর অধিক নিকটজন।’ এর পর তিনি এদিন রোজা রাখলেন এবং সবাইকে রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন।’ (বুখারি : ২০০৪)

হজরত ঈসা (আ.)-এর রোজা: প্রথমটি হলো, তাদের পিতার উপদেশে নির্দিষ্ট কয়েক দিন খাদ্যপানীয় থেকে বিরত থাকা; আর ইফতার হবে নিরামিষ দিয়ে, তাতে মাছ-মাংস ও দুগ্ধজাত জিনিস খাওয়া যাবে না। যেমন- বড় দিনের রোজা, তাওবার রোজা, যা ৫৫ দিন পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। এমনিভাবে সপ্তাহে বুধ ও শুক্রবারের রোজা। দ্বিতীয়টি হলো, খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকা, তবে শুধু মাছ খাওয়া যেত। এই রোজার মধ্যে ছোট রোজা বা জন্মদিনের রোজা, যা ৪৩ দিন দীর্ঘায়িত হয়, দূতদের রোজা, মারইয়ামের রোজা ইত্যাদি। তবে খ্রিষ্টধর্মে ফরজ বলতে কোনো রোজা ছিল না। (তাফসিরে তাবারি : ৩/৪১১)

ঈসা (আ.) দ্বীন প্রচারের শুরুতে ইনজিল পাওয়ার আগে জঙ্গলে ৪০ দিন সিয়াম-সাধনা করেছিলেন। একদিন তাঁকে তাঁর অনুসারীরা জিজ্ঞেস করেন যে, ‘আমরা অপবিত্র আত্মাকে কী করে বের করব?’ জবাবে তিনি বলেন, ‘দোয়া ও রোজা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে বের হতে পারে না।’ (মথি : ৭-৬৬; সিরাতুন্নবি : ৫/২৮৭-২৮৮)

সুলাইমান (আ.)-এর রোজা : নবী সুলাইমান (আ.) প্রতি মাসে ৯টি করে রোজা রাখতেন। মাসের প্রথম দশকে তিনটি, মাঝের দশকে তিনটি ও শেষ দশকে তিনটি। (কানজুল উম্মাল, হাদিস : ২৪৬২৪)

এই ছিল c~e©eZ©x D¤§‡Z †ivhvi BwZnvm|

রমযানের রোজা ফরয হওয়ার ইতিহাস

রমজানের রোজার পালনের নির্দেশ:

মুয়াজ ইবন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নামাজ তিন ধাপে পরিবর্তিত হয়েছে এবং রোজাও তিন ধাপে পরিবর্তিত হয়েছে। রোজার তিন ধাপের তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

প্রথম ধাপ : রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রতি মাসে তিন দিন (আইয়ামে বিজ তথা চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোজা) এবং আশুরার রোজা (১০ মহররম) পালন করতেন। দ্বিতীয় ধাপ : এরপর অবতীর্ণ হয়—(হে মুমিনরা! তোমাদের জন্য রোজার বিধান দেওয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদের দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো। রোজা নির্দিষ্ট কয়েক দিনের। তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পুরো করে নিতে হবে। তা যাদের অতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য, এর পরিবর্তে ফিদয়া—একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সত্ কাজ করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। আর রোজা পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ যদি তোমরা জানতে)। (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১৮৩-১৮৪)

তখন যে চায় রোজা রাখে আর যে চায় রোজা না রেখে এর পরিবর্তে ফিদয়া—একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করে। এভাবে এক বছর যায়।

তৃতীয় ধাপ : এর পর মদিনায় দ্বিতীয় হিজরির ১০ শাবান মুমিন মুসলমানের ওপর রমজানের রোজা ফরজ হয়। আল্লাহ তাআলা আয়াত নাজিল করেন-
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
‘রমজান মাস, এ মাসেই নাজিল করা হয়েছে কুরআন। মানুষের জন্য হেদায়েত, সৎপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী।

অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে রোজা পালন করে। তবে কেউ রোগাক্রান্ত হলে অথবা সফরে থাকলে এ সংখ্যা অন্য সময় পূরণ করবে।

তার পর থেকে রমজান মাস উপস্থিত হলে রোজার আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়। আর মুসাফিরদের জন্য কাজা আদায় এবং রোজা আদায়ের সামর্থ্য নেই—এমন বৃদ্ধদের জন্য ফিদয়া প্রদানের সুযোগ অব্যাহত থাকে। (আবু দাউদ, হাদিস : ৫০৭)

আল্লাহ চান তোমাদের জন্য যা সহজ তা, আর তিনি চান না তোমাদের জন্য যা কষ্টকর তা, যেন তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করো এবং আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করো, তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করার জন্য এবং যেন তোমরা শুকরিয়া আদায় করতে পার।’ (সুরা বাকারা : আয়াত ১৮৫)

রমাযানের রোযা প্রত্যেক সাবালক, জ্ঞানসম্পন্ন, সামর্থ্যবান, গৃহবাসী (অমুসাফির), সুস্থ ও সকল বাধা থেকে মুক্ত মুসলিম নরনারীর উপর ফরয। এই কথাকে ভিত্তি করে রমাযানের রোযায় পৃথিবীর সকল মানুষ কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আর প্রত্যেক ভাগের রয়েছে পৃথক পৃথক আহকাম ও মাসায়েল। আমরা সেই সব কথাই আলোচনা করব - ইন শাআল্লাহ।

(১) কাফের

কাফের বা অমুসলিমের জন্য রোযা এ দুনিয়ায় আদায়যোগ্য ওয়াজেব নয়। কেননা, সে রোযা রাখলেও তা শুদ্ধ হবে না এবং আল্লাহর দরবারে কবুলও হবে না। যেহেতু রোযা (অনুরূপ যে কোন ইবাদত) শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হল ইসলাম। (যেমন শর্ত হল ইখলাস ও মুহাম্মাদী তরীকা।) মহান আল্লাহ বলেন,

(وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهِ وَلاَ يَأْتُوْنَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنْفِقُوْنَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُوْنَ)

অর্থাৎ, ওদের অর্থ সাহায্য গ্রহণে বাধা কেবল এই ছিল যে, ওরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করে, নামাযে শৈথিল্যের সাথে হাজির হয় এবং একান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবেই দান করে। (কুরআনুল কারীম ৯/৫৪)

বলা বাহুল্য, দানের মত জিনিস; যার উপকার অপরের উপর বর্তে -তা যদি কবুল না হয়, তাহলে অন্যান্য ইবাদত বেশী কবুল না হওয়ার কথা।

কোন কাফের যদি রমাযানের দিনে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে দিনের অবশিষ্টাংশ রোযা নষ্টকারী জিনিস হতে তাকে বিরত থাকতে হবে। কেননা, মুসলিম হওয়ার সাথে সাথে রোযা তারও উপর ওয়াজেব হয়ে যায়। অবশ্য ইসলাম কবুল করার পূর্বে যে রোযা অতিবাহিত হয়ে গেছে তা আর কাযা করতে হবে না। কারণ, সে সময় তার উপর রোযা ওয়াজেব ছিল না। মহান আল্লাহ বলেন,

(قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنِ انْتَهَوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ)

অর্থাৎ, কাফেরদেরকে বল, যদি তারা (কুফরী থেকে) বিরত হয়, তাহলে তাদের অতীতের পাপ মাফ করে দেওয়া হবে। (কুরআনুল কারীম ৮/৩৮)

আর যেহেতু লোকেরা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মুসলমান হত, অথচ তিনি তাঁদেরকে তাদের (ইসলামের পূর্বে) ছুটে যাওয়া নামায, যাকাত বা রোযা কাযা করতে আদেশ করতেন না।

কিন্তু মহান আল্লাহ কাল কিয়ামতে তা ত্যাগ করার জন্য এবং অনুরূপ দ্বীনের সকল ওয়াজেব কর্ম ত্যাগ করার জন্য কাফেরদেরকেও শাস্তি দেবেন। সেদিন মুমিনরা কাফেরদেরকে দোযখে যাওয়ার কারণ প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন করবে, সেই কথা মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে উল্লেখ করে বলেন,

(مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَر؟ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ، وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنَ)

অর্থাৎ, কিসে তোমাদেরকে সাকার (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা নামাযী ছিলাম না, মিসকীনকে আহার্য দান করতাম না, অন্যায় আলোচনাকারীদের সাথে আলোচনায় যোগ দিতাম এবং কিয়ামতের দিনকে মিথ্যা মনে করতাম। (কুরআনুল কারীম ৭৪/৪২-৪৬)(আশশারহুল মুমতে' ৬/৩৩১-৩৩২, ফাইযুর রাহীমির রাহমান, ফী আহকামি অমাওয়াইযি রামাযান ৮৬পৃঃ, ইবনে উষাইমীন ফাসিঃ মুসনিদ ২৬পৃঃ)

মুসলিম রোযাদারদের সামনে অমুসলিমদের রমাযানের দিনে পানাহার করায় কোন ক্ষতি নেই। কেননা, তাতে রোযাদার মুসলিম আল্লাহ আযযা অজাল্লার প্রশংসা করবে যে, তিনি তাকে ইসলামের প্রতি পথপ্রদর্শন করেছেন; যে ইসলামে রয়েছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ। (তাদেরকে দেখে) আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করবে যে, তিনি তাদের ঐ (ভ্রষ্টতার) আপদ থেকে মুক্তি দিয়েছেন; যারা তাঁর হেদায়াতের আলো গ্রহণ করেনি। আর বিদিত যে, মুসলিমের জন্য যদিও এ দুনিয়াতে রমাযানের দিনে শরীয়তের আইন অনুযায়ী পানাহার করা নিষিদ্ধ, কিন্তু কিয়ামতের দিন সে তার উপযুক্ত বিনিময় প্রাপ্ত হবে। সেদিন তাকে বলা হবে,

(كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِيْ الأَيَّامِ الْخَالِيَة)

অর্থাৎ, তোমরা পার্থিব জীবনে ভালো কাজ করেছিলে তারই কারণে (আজ) তৃপ্তির সাথে পানাহার কর। (কুরআনুল কারীম ৬৯/২৪)

অবশ্য সাধারণ স্থানে অমুসলিমদেরকে প্রকাশ্যভাবে পানাহার করতে বারণ করতে হবে। কারণ, তা ইসলামী রাষ্টে্র পরিবেশের প্রতিকূল।(সুআলান ফিস্-সিয়াম ৫০-৫১পৃঃ)

(২) নামায-ত্যাগী

যে ব্যক্তি নামায ফরয হওয়ার কথা অস্বীকার করে এবং ইচ্ছাকৃত তা ত্যাগ করে সে ব্যক্তি উলামাদের সর্বসম্মতভাবে কাফের। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অবহেলায় অলসতার

দরুন নামায ত্যাগ করে, সে ব্যক্তিও উলামাদের শুদ্ধ মতানুসারে কাফের। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘‘মানুষ এবং কুফর ও শির্কের মাঝে (অন্তরাল) নামায ত্যাগ।’ (মুসলিম ৮২নং)’

তিনি আরো বলেন, ‘‘আমাদের মাঝে ও ওদের মাঝে চুক্তিই হল নামায। যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করে সে কাফের।’’ (আহমাদ, মুসনাদ, তিরমিযী ২৬২১, ইবনে মাজাহ ১০৭৯নং, হাকেম, মুস্তাদ্রাক, ইবনে হিববান, সহীহ, সহীহ তারগীব, আলবানী ৫৬১নং)

এখানে কাফের বা কুফর বলতে সেই কুফরকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। যেহেতু মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নামাযকে মুমিন ও কাফেরদের মাঝে অন্তরাল বলে চিহ্নিত করেছেন। আর এ কথা বিদিত যে, কুফরীর মিল্লত ইসলামী মিল্লাত থেকে ভিন্নতর। সুতরাং যে ব্যক্তি ঐ চুক্তি পালন না করবে সে কাফেরদের একজন।(ইবনে উষাইমীন, হুকমু তারিকিস সক্ষলাহ, ইবনে উষাইমীন ৯পৃঃ)

আব্দুল্লাহ বিন শাক্বীক্ব উকাইলী বলেন, ‘নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) -এর সাহাবাবৃন্দ নামায ছাড়া অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না।’ (তিরমিযী ২৬২২, হাকেম, মুস্তাদ্রাক, সহীহ তারগীব, আলবানী ৫৬২নং) [4]

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি কাফের প্রতীয়মান হবে সে ব্যক্তির রোযা ও সকল প্রকার ইবাদত পন্ড হয়ে যাবে। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

(وَلَوْ أَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ)

অর্থাৎ, তারা যদি শির্ক করত, তাহলে তাদের কৃতকর্ম পন্ড হয়ে যেত। (কুরআনুল কারীম ৬/৮৮)

তদনুরূপ সেই সকল রোযাদার যারা কেবল রমাযান মাসে নামায পড়ে এবং বাকী ১১ মাস নামায পড়ে না, তারা আসলে আল্লাহকে ধোকা দেয়। কত নিকৃষ্ট সেই জাতি, যে জাতি নিজ পালনকর্তা আল্লাহকে কেবল রমাযান মাসেই চিনে; অন্য মাসে চিনে না। এই শ্রেণীর লোকেদের অরমাযানে নামায না পড়ার কারণেই রোযাও শুদ্ধ হবে না।

তবে তারা রোযা ছাড়তে আদিষ্ট বা উপদিষ্ট নয়। কেননা, রোযা রাখলে তাদের জন্য মঙ্গলেরই আশা করা যায়। এতে তারা দ্বীনের নৈকট্য পেতে প্রয়াস পাবে। তাদের হৃদয়ে যে আল্লাহভীতিটুকু আছে তার মাঝেই আশা করা যায় যে, তারা তওবা করে ১২ মাস নামায পড়াও ধরবে।(স্থায়ী উলামা কমিটি, ফাসিঃ মুসনিদ ২৮-২৯পৃঃ)

(৩) **শিশু**

নাবালক ছোট শিশুর জন্য রোযা ফরয নয়। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘‘তিন ব্যক্তি নিকট থেকে (পাপ লিখার) কলম তুলে নেওয়া হয়েছে; জ্ঞানশূন্য পাগলের নিকট থেকে; যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়েছে। ঘুমন্ত ব্যক্তির নিকট থেকে; যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়েছে। আর শিশুর নিকট থেকে; যতক্ষণ না সে সাবালক হয়েছে।’’ (আহমাদ, মুসনাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম, মুস্তাদ্রাক, সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ৩৫১২-৩৫১৪নং) [1]

অবশ্য জ্ঞানবান শিশু রোযা রাখলে শুদ্ধ হবে এবং সওয়াবও পাবে। আর তার পিতা-মাতার জন্যও রয়েছে তরবিয়ত ও ভালো কাজের নির্দেশ দেওয়ার সওয়াব।

সুতরাং অভিভাবকদের উচিৎ, রোযা রাখতে সক্ষম ছোট শিশুদেরকে রোযা রাখতে আদেশ করা, উৎসাহ দিয়ে তাদেরকে এই বিরাট ইবাদতে অভ্যাসী করা এবং তার জন্য উদ্বুদ্ধকারী পুরস্কার ও উপহার নির্ধারিত করা। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবাগণ নিজ নিজ ছোট বাচ্চাদেরকে রোযা রাখতে আদেশ দিতেন। রুবাইয়ে’ বিন্তে মুআওবিয (রাঃ) বলেন, আশূরার সকালে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মদ্বীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত আনসারদের মহল্লায় বলে পাঠালেন যে, ‘‘যে ব্যক্তি ফজরের আগে থেকেই রোযা রেখেছে, সে যেন তার রোযা পূরণ করে। আর যে ব্যক্তির রোযা না রেখে ফজর হয়েছে, সেও যেন বাকী দিন রোযা রাখে।’’ সুতরাং আমরা তার পর থেকে রোযা রাখতাম। আমাদের ছোট শিশুদেরকে -আল্লাহর ইচ্ছায়- রোযা রাখাতাম এবং তাদেরকে নিয়ে মসজিদে যেতাম। তাদের জন্য তুলো দ্বারা পুতুল গড়তাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদতে লাগলে তাকে ঐ পুতুল দিতাম। আর এইভাবে ইফতারের সময় হয়ে যেত। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমরা তাদেরকে ঐ খেলনা দিতাম, যাতে তারা ভুলে থাকে এবং খেলার ঘোরে তাদের রোযা পূর্ণ করতে পারে।(মুসলিম ১১৩৫নং)

শিশু (স্বপ্নদোষ হয়ে) দিনের ভিতরে সাবালক হলে দিনের বাকী অংশ রোযা নষ্টকারী জিনিস থেকে বিরত হবে। কারণ, এক্ষণে তার জন্য রোযা ফরয। অবশ্য এর পূর্বের রোযাগুলো কাযা রাখতে হবে না। কেননা, পূর্বে তার উপর রোযা ফরয ছিল না।(মাসআলাহ ফিস্-সিয়ামঃ ১২নং)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, তিনটির মধ্যে একটি লক্ষণ দেখে সাবালক চেনা যায়; স্বপ্নদোষ বা অন্য প্রকারে সকাম বীর্যপাত হওয়া, নাভির নীচে মোটা লোম গজানো, অথবা ১৫ বছর বয়স হওয়া।

আর বালিকাদের ক্ষেত্রে একটি অধিক লক্ষণ হল, মাসিক শুরু হওয়া। বলা বাহুল্য, বালিকার মাসিকের খুন আসতে শুরু হলেই সে সাবালিকা; যদিও তার বয়স ১০ বছর হয়।(আশশারহুল মুমতে’ ৬/৩৩৩, ফাইযুর রাহীমির রাহমান, ফী আহকামি অমাওয়াইযি রামাযান ৮৭পৃঃ, ফুসূলুন ফিস্-সিয়ামি অত্-তারাবীহি অয্-যাকাহ ৫পৃঃ)

(৪) পাগল

পাগলের উপর রোযা ফরয নয়। কারণ, তার উপর থেকে কলম তুলে নেওয়া হয়েছে; যেমন পূর্বোক্ত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপ আধ-পাগলা, যার ভালো-মন্দের তমীয নেই এবং অনুরূপ স্থবির বৃদ্ধ, যার তমীয-জ্ঞান নষ্ট হয়ে গেছে। এ সকল জ্ঞানহীন মানুষদের তরফ থেকে খাদ্যদানও ওয়াজেব নয়।(ইবনে উষাইমীন, ফাসিঃ ৫৯পৃঃ)

পাগল দিনের ভিতরে সুস্থ হলে তার জন্য দিনের বাকী অংশ রোযা নষ্টকারী জিনিস থেকে বিরত হওয়া জরুরী। কারণ, এক্ষণে তার জন্য রোযা ফরয। অবশ্য এর পূর্বের রোযাগুলো কাযা রাখতে হবে না। কেননা, পূর্বে তার উপর রোযা ফরয ছিল না।

পাগলের উপর থেকে (পাপের) কলম তুলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পাগল যদি এমন হয় যে, ক্ষণে পাগল ক্ষণে ভালো, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য ভালো থাকা অবস্থায় রোযা নষ্টকারী জিনিস থেকে বিরত থাকা জরুরী। আর পাগল থাকা অবস্থায় তা ধর্তব্য নয়। পক্ষান্তরে ভালো থাকা অবস্থায় রোযা রেখে দিনে হঠাৎ পাগল হয়ে গেলে তার রোযা বাতিল নয়। যেমন কেউ যদি কোন রোগ বা আঘাত ইত্যাদির কারণে বেহুঁশ বা অজ্ঞান হয়ে যায় তাহলে তার রোযাও নষ্ট হয় না। কেননা, সে জ্ঞান থাকা অবস্থায় রোযার নিয়ত করেছে, অতএব অজ্ঞান হলেও সে নিয়ত নষ্ট হবে না। এই বিধান মূর্ছা, হিষ্টিরিয়া বা জিন পাওয়া রোগীরও।

যদি কেউ রোযা রাখার ফলে (ক্ষুধার তাড়নায়) বেহুঁশ হয়ে যায়, তাহলে সে রোযা ভেঙ্গে কাযা করতে পারে। দিনের বেলায় কেউ বেহুঁশ হলে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে কিংবা পরে হুঁশ ফিরে এলে তার রোযা শুদ্ধ। যেহেতু সে ভোরে ভালো অবস্থায় রোযা রেখেছে। অবশ্য যদি কেউ ফজর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বেহুঁশ থাকে, তাহলে অধিকাংশ উলামার মতে তার রোযা শুদ্ধ নয়। কিন্তু অধিকাংশ উলামার মতে সে রোযার

কাযা করতে হবে; তাতে বেহুঁশ থাকার সময় যতই বেশী হোক না কেন।(সাবঊনা মাসআলাহ ফিস্-সিয়াম ২৬নং, আশ্শারহুল মুমতে’ ৬/৩৬৫)

কোন কোন আহলে ইল্মের ফতোয়া মতে যে ব্যক্তি বেহুঁশ হয়ে থাকে বা (হূদ্যন্ত্র বন্ধ হওয়ার ফলে) কিছুকাল নিস্পন্দ থাকে, অথবা নিজের কোন মঙ্গলের জন্য জ্ঞানশূন্যকারী ওষুধ ব্যবহার করে অচেতন থাকে এবং তা যদি ৩ দিনের কম হয় তাহলে সে ঐ বেহুঁশ বা অচেতন থাকার দিনগুলো কাযা করবে; যেমন কেউ ঘুমিয়ে থেকে নামায নষ্ট করলে তাকে কাযা করতে হয়। পক্ষান্তরে ৩ দিনের বেশী হলে কাযা করতে হবে না; যেমন পাগলকে কাযা করতে হয় না।(মাসআলাহ ফিস্-সিয়াম ৭০ঃ ২৬নং)

ঘুমন্ত ব্যক্তি যদিও তার উপর থেকে কলম তুলে নেওয়া হয়ে থাকে, তবুও তার রোযা শুদ্ধ, তাকে আর কাযা করতে হবে না; যদিও সে সারাটি দিন ঘুমিয়ে থাকে। কারণ, ঘুম হল স্বাভাবিক কর্ম। আর তাতে সার্বিকভাবে অনুভূতি নষ্ট হয় না।(আশ্শারহুল মুমতে’ ৬/৩৬৬, আসাইঃ ৬৩পৃঃ)

(৫) অক্ষম ব্যক্তি

-

১। বৃদ্ধ ও স্থবির বা অথর্ব ব্যক্তি, যার শারীরিক ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং দিনের দিন আরো খারাপের দিকে যেতে যেতে মরণের দিকে অগ্রসর হতে চলেছে, সে ব্যক্তির জন্য রোযা ফরয নয়। কষ্ট হলে সে রোযা রাখবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

(وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ)

অর্থাৎ, যারা রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৪)

ইবনে আববাস (রাঃ) বলতেন, এই আয়াত মনসূখ নয়। তারা হল অথর্ব বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যারা রোযা রাখতে সক্ষম নয়। তারা প্রত্যেক দিনের বদলে একটি করে মিসকীনকে খাদ্য দান করবে।(বুখারী ৪৫০৫নং)

অবশ্য এমন বৃদ্ধ, যার কোন জ্ঞানই নেই, তার জন্য এবং তার পরিবারের জন্য কোন কিছু ফরয নয়। তার তরফ থেকে রোযা রাখতে বা কাযা করতেও হবে না এবং মিসকীনও খাওয়াতে হবে না। কারণ, শরীয়তের সকল ভার তার পক্ষে মাফ হয়ে গেছে। কিন্তু সে যদি এমন বৃদ্ধ হয়, যে কখনো কখনো ভালো-মন্দের তমীয করতে পারে, আবার কখনো কখনো আবোল-তাবোল বকে, তাহলে যে সময় সে ভালো থাকে সেই সময় তার জন্য রোযা বা খাদ্যদান ফরয এবং যে সময় তমীয-জ্ঞান থাকে না সে

সময় ফরয নয়।(মাসআলাহ ফিস্-সিয়াম, মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-মুনাজ্জিদ৭০ঃ ৩০নং)

২। এমন চিররোগা, যার রোগ ভালো হওয়ার কোন আশা নেই; যেমন ক্যা¦সারের রোগী (পেট খালি রাখলে পেটে যন্ত্রণা হয়) এমন রোগা ব্যক্তির জন্য রোযা ফরয নয়। কারণ, তার এমন কোন সময় নেই, যে সময়ে সে তা রাখতে পারে। অতএব তার তরফ থেকে একটি রোযার পরিবর্তে একটি করে মিসকীন খাওয়াতে হবে।(ইবনে উষাইমীন, ফুসিতাযাঃ ৯পৃঃ)

1. খাদ্যদানের নিয়মঃ

মিসকীনকে খাদ্যদানের ২টি নিয়ম আছেঃ-

প্রথম এই যে, এক দিন খাবার তৈরী করে রোযার সংখ্যা হিসাবে মিসকীন ডেকে খাইয়ে দেবে। (অথবা এক জন মিসকীনকেই ঐ পরিমাণ দিন খাইয়ে দেবে।) আনাস (রাঃ) বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাই করতেন। তিনি এক অথবা দুই বছর রোযা রাখতে না পারলে প্রত্যহ মিসকীনকে মাংস-রুটী খাইয়েছেন।(বুখারী ৯২৮-৯২৯নং)

দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, অপক্ক খাদ্য দান করবে। অর্থাৎ, দেশের প্রধান খাদ্য থেকে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে প্রত্যেক মিসকীনকে মোটামুটি সওয়া এক কিলো করে খাদ্য (চাল অথবা গম) দান করবে। যেহেতু কা’ব বিন উজরার ইহরাম অবস্থায় মাথায় উকুন হলে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বলেন, “তোমার মাথা মুন্ডন করে ফেল এবং তিন দিন রোযা রাখ, কিংবা প্রত্যেক মিসকীনকে মাথাপিছু অর্ধ সা’ (মোটামুটি সওয়া এক কিলো) করে ছয়টি মিসকীনকে খাদ্য দান কর, কিংবা একটি ছাগ কুরবানী কর।” (বুখারী ১৮১৬, মুসলিম ১২০১নং)

অবশ্য সেই সাথে কিছু মাংস বা কোন তরকারীও মিসকীনকে দান করা উচিৎ। যাতে মহান আল্লাহর এই বাণীর পরিপূর্ণ আনুগত্য সম্ভব হয়;

(وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ)

অর্থাৎ, যারা রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৪)

খাদ্য দান কখন করবে -সে ব্যাপারে এখতিয়ার আছে। যদি প্রত্যেক দিন একটা করে রোযার ফিদয়া দান করে, তাও চলবে। যদি মাসের শেষে সব দিনগুলি হিসাব করে একই দিনে তা দান করে, তাও চলবে। এ ব্যাপারে বাধ্য-বাধকতা কিছু নেই। তবে

রোযার আগেই দেওয়া চলবে না। কারণ, তা আগে রোযা রাখার মত হয়ে যাবে। আর রমাযানের আগে শা’বানে কি ফরয রোযা রাখা চলবে?(আশশারহুল মুমতে’ ৬/৩৩৫)
সমস্ত খাদ্যকে রোযার সংখ্যা পরিমাণ মিসকীনের মাঝে ব¦টন করা যাবে। যেমন সমস্ত খাদ্য কেবল উপযুক্ত একজন মিসকীন অথবা একটি মাত্র মিসকীন পরিবারকেও দেওয়া যাবে।(ইবনে জিবরীন, ফাসিঃ জিরাইসী ৩২পৃঃ)
৩। যে ব্যক্তির রোগ সাময়িক, যা সেরে যাওয়ার আশা আছে; যেমন জ্বর ইত্যাদি, এমন ব্যক্তির ৩ অবস্থা হতে পারেঃ
(ক) রোযা রাখলে তার কষ্ট হবে না বা রোযা তার কোন ক্ষতি করবে না। এমন অবস্থায় তার জন্য রোযা রাখা ওয়াজেব। কারণ, তার কোন ওজর নেই।
(খ) রোযা রাখলে তার কষ্ট হবে, কিন্তু রোযা তার কোন ক্ষতি করবে না। এমন অবস্থায় তার জন্য রোযা রাখা মকরূহ। কারণ, তাতে আল্লাহর দেওয়া অনুমতি ও তার আত্মার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা থেকে ভিন্ন আচরণ হয়ে যায়। অথচ মহান আল্লাহ বলেন,
(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر)
অর্থাৎ, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ বা মুসাফির হলে সে অপর কোন দিন গণনা করবে। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৪)
(গ) রোযা রাখলে রোযা তার ক্ষতি করবে। (রোগ বৃদ্ধি করবে, অথবা কোন বড় রোগ আনয়ন করবে, অথবা তার অবস্থা মরণাপন্ন হয়ে যাবে।) এমতাবস্থায় তার জন্য রোযা রাখা হারাম। কেননা, নিজের উপর ক্ষতি ডেকে আনা বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন,
(وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْماً)
অর্থাৎ, তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল। (কুরআনুল কারীম ৪/২৯)
তিনি আরো বলেন,
(وَلاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة)
অর্থাৎ, তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। (কুরআনুল কারীম ২/১৯৫)
হাদীসে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘‘কেউ নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং অপরেরও ক্ষতি করবে না।’’ (আহমাদ, মুসনাদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, মুস্তাদ্রাক, বাইহাকী, দারাকুত্বনী, সুনান, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ২৫০নং)
রোযা রোযাদারকে ক্ষতি করছে কি না তা জানা যাবে, রোযাদারের নিজে নিজে ক্ষতি অনুভব করার মাধ্যমে অথবা বিশ্বস্ত কোন ডাক্তারের ফায়সালা অনুযায়ী।

এই শ্রেণীর রোগী যে দিনের রোযা ত্যাগ করবে, সেই দিনের রোযা পরবর্তীতে সুস্থ হলে অবশ্যই কাযা করবে। আর এমন রোগীর তরফ থেকে মিসকীনকে খাদ্যদান যথেষ্ট নয়।(আশশারহুল মুমতে' ৬/৩৩৬-৩৩৮, ফুসূলুন ফিস্-সিয়ামি অত্-তারাবীহি অয্-যাকাহ ৯-১০পৃঃ)

শেষোক্ত প্রকার কোন রোগী যদি কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করেও রোযা রাখে, তাহলেও তার রোযা শুদ্ধ ও যথেষ্ট হবে না। বরং তাকে সুস্থ অবস্থায় কাযা করতে হবে।(মুহাল্লা ইবনে হাযম ৬/২৫৮)

কারণ, ঐ সময় তার জন্য রোযা রাখা নিষিদ্ধ। যেমন তাশরীক ও ঈদের দিনগুলিতে রোযা রাখা নিষিদ্ধ; যা রাখা বৈধ নয় এবং রাখলে শুদ্ধও নয়।

এখান থেকে কিছু মুজতাহিদ রোগীদের ভ্রান্ত ফায়সালার কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যারা রোযা তাদের জন্য কষ্টকর ও ক্ষতিকর হওয়া সত্ত্বেও তা কাযা করতে চায় না। আমরা বলি যে, তারা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। তারা মহান আল্লাহর দান গ্রহণ করে না, তাঁর দেওয়া অনুমতি কবুল করে না এবং নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অথচ তিনি বলেন, ''তোমরা আত্মহত্যা করো না।'' (আশশারহুল মুমতে' ৬/৩৫৩)

পক্ষান্তরে রোগ হাল্কা হলে; যেমন সর্দি-কাশি, মাথা ধরা, গা ব্যথা ইত্যাদি হলে তার ফলে রোযা ভাঙ্গা জায়েয নয়। অবশ্য যদি কোন ডাক্তারের মাধ্যমে, অথবা নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, অথবা প্রবল ধারণা মতে জানতে পারে যে, রোযা রাখলে তার রোগ বৃদ্ধি পাবে, অথবা ভালো হতে দেরী হবে, অথবা অন্য রোগ আনয়ন করবে, তাহলে তার জন্য রোযা না রাখা এবং পরে কাযা করে নেওয়া বৈধ। বরং এ ক্ষেত্রে রোযা রাখা মকরূহ।

আর দিবারাত্র লাগাতার রোগ থাকলে রোগীর জন্য রাতে রোযার নিয়ত করা ওয়াজেব নয়; যদিও সকালে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেহেতু সে ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতিই বিচার্য।

(৬) গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মহিলা

গর্ভবতী অথবা দুগ্ধদাত্রী মহিলা রোযা রাখার দরুন যদি নিজেদের কষ্ট হয় অথবা তাদের শিশুর ক্ষতির আশঙ্কা করে, তাহলে উভয়ের জন্য রোযা না রেখে যখন সহজ হবে অথবা ক্ষতির আশঙ্কা দূর হবে তখন রোযা কাযা করে নেওয়া বৈধ।(ইবনে উষাইমীন, ফাসিঃ ৫৯পৃঃ)

বলা বাহুল্য, (কিছু উলামার নিকট) গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মহিলাকে রোগীর উপর কিয়াস করাই সঠিক। সুতরাং রোগীর মত তাদের জন্য রোযা না রাখা বৈধ এবং তাদের জন্য সময় মত কাযা ছাড়া অন্য কিছু ওয়াজেব নয়। এতে তারা নিজেদের ক্ষতির আশঙ্কা করুক অথবা তাদের শিশুদের। যেহেতু মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘‘আল্লাহ মুসাফিরের উপর থেকে (যথাসময়ে) রোযা এবং অর্ধেক নামায, আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মহিলার উপর থেকে (যথাসময়ে) রোযা লাঘব করেছেন।’’ (আহমাদ, মুসনাদ ৪/৩৪৭, আবূ দাঊদ ২৪০৮, তিরমিযী ৭১৫, নাসাঈ ২২৭৬, ইবনে মাজাহ ১৬৬৭, সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ১৮৩৫নং) [2]

উপরোক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, তারা রমাযানে রোযা না রেখে সময় মত কাযা করতে পারে। রোযা একেবারেই মাফ নয়।(আশ্শারহুল মুমতে’ ৬/৩৬২)

পক্ষান্তরে যাঁরা তাদের জন্য কাযা করার সাথে সাথে মিসকীনকে খাদ্যদানেরও কথা বলে থাকেন, তাঁদের কথার উপর কিতাব ও সুন্নাহর কোন দলীল নেই। আর মূল হল দায়িত্বে কিছু না থাকা, যতক্ষণ না দায়িত্ব আসার সপক্ষে কোন দলীল কায়েম হয়েছে।(ইবনে উষাইমীন, ফাসিঃ মুসনিদ ৬৬পৃঃ)

কোন কোন আহলে ইল্ম এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মহিলার জন্য (চিররোগা ও অক্ষম বৃদ্ধের মত) কেবল খাদ্যদানই ওয়াজেব; কাযা ওয়াজেব নয়। এ মত পোষণ করেছেন ইবনে আববাস, ইবনে উমার ও সাঈদ বিন জুবাইর। ইবনে আববাস এ ব্যাপারে স্পষ্ট বলেন, ‘ওরা প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে একটি করে মিসকীন খাওয়াবে; রোযা কাযা করবে না।’

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, একদা তিনি তাঁর ক্রীতদাসী স্ত্রীকে গর্ভ বা দুধ দান করা অবস্থায় দেখে বললেন, ‘তুমি অক্ষম ব্যক্তির মত। তোমার জন্য প্রত্যেক রোযার বিনিময়ে একটি করে মিসকীন খাওয়ানো ওয়াজেব। তোমার জন্য কাযা ওয়াজেব নয়।’ (ইরওয়াউল গালীল, আলবানী ৪/১৭-২৫ দ্রঃ)

তিনিই মহান আল্লাহর এই বাণী ‘‘যারা রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। *(কুরআনুল কারীম ২/১৮৪)* এর তফসীরে বলেছেন, ‘আর গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী মহিলা রোযা রাখতে ভয় করলে রোযা না রেখে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে একটি করে মিসকীন খাওয়াবে।’ সুতরাং স্পষ্ট উক্তির বর্তমানে কিয়াসের কোন প্রয়োজন নেই।

অবশ্য ইবনে আববাসের এই মত সেই মহিলার জন্য প্রযোজ্য, যে মহিলা প্রত্যেক দুই-আড়াই বছর পর পর সন্তান ধারণ করে। কারণ, এই শ্রেণীর মহিলা কাযা করার ফুরসতই পাবে না। যে কোন সময়ে হয় সে গর্ভবতী থাকবে, নচেৎ দুগ্ধদায়িনী। আর গর্ভ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তার রোযা রাখার সুযোগই হয়ে উঠবে না। অতএব সে মিসকীনকে খানা খাইয়ে দেবে এবং তার জন্য রোযা মাফ। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

(৭) রোযা ভাঙ্গতে বাধ্য ব্যক্তি

-

কোন মৃত্যু-কবলিত মানুষকে আগুন, পানি বা ধ্বংসস্তুপ থেকে বাঁচাতে যদি কোন রোযাদারকে রোযা ভাঙ্গতে হয় এবং সে ছাড়া অন্য কোন রোযাহীন লোক না পাওয়া যায়, তাহলে প্রাণ রক্ষার জন্য তার পক্ষে রোযা ভাঙ্গা ওয়াজেব। অবশ্য সে ঐ দিনটিকে পরে কাযা করতে বাধ্য।(ফাতাওয়া শায়খ ইবনে উষাইমীন ৬০পৃঃ)

তবে এ ব্যাপারে প্রশস্ততা বৈধ নয়। বরং কেবল অতি প্রয়োজনীয় ও একান্ত নিরুপায়ের ক্ষেত্রে দরকার মোতাবেক এ অনুমোদন প্রয়োগ করা উচিৎ। বিশেষ করে যাঁরা ফায়ার ব্রিগেডে কাজ করেন, তাঁদের জন্য একান্ত কঠিন কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়া রোযা ভাঙ্গা বৈধ নয়। অন্যথা কোন আগুন নিভাতে যাওয়াই তাঁদের জন্য রোযা ভাঙ্গা বৈধ করতে পারে না।(ফাইযুর রাহীমির রাহমান, ফী আহকামি অমাওয়াইযি রামাযান ১৮৯পৃঃ)

যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় প্রচন্ড ক্ষুধা অথবা পানি-পিপাসায় কাতর হয়ে প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা করে, অথবা ভুল ধারণায় নয়, বরং প্রবল ধারণায় বেহুশ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে, সে ব্যক্তি রোযা ভেঙ্গে প্রয়োজন মত পানাহার করতে পারে। তবে সে রোযা তাকে পরে কাযা করতে হবে। কারণ, জান বাঁচানো ফরয। আর মহান আল্লাহ বলেন, (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)

“তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।” (কুরআনুল কারীম ২/১৯৫)

(وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً)

“তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল।” (কুরআনুল কারীম ৪/২৯)

কোন ধারণাপ্রসূত কষ্ট, ক্লান্তি অথবা রোগের আশঙ্কায় রোযা ভাঙ্গা বৈধ নয়।

যারা কঠিন পরিশ্রমের কাজ করে তাদের জন্যও রোযা ছাড়া বৈধ নয়। এ শ্রেণীর লোকেরা রাত্রে রোযার নিয়ত করে রোযা রাখবে। অতঃপর দিনের বেলায় কাজের

সময় যদি নিশ্চিত হয় যে, কাজ ছাড়লে তাদের ক্ষতি এবং কাজ করলে তাদের প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা আছে, তাহলে তাদের জন্য রোযা ভেঙ্গে কেবল ততটুকু পানাহার বৈধ হবে, যতটুকু পানাহার করলে তাদের জান বেঁচে যাবে। অতঃপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আর পানাহার করবে না। অবশ্য রমাযান পরে তারা ঐ দিনটিকে কাযা করতে বাধ্য হবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর সাধারণ বিধান হল,

(لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)

অর্থাৎ, আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সাধ্যের অতীত ভার অর্পণ করেন না। (কুরআনুল কারীম ২/২৮৬)

(مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ) (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ)

অর্থাৎ, আল্লাহ দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি। (কুরআনুল কারীম ৫/৬, ২২/৭৮)

বলা বাহুল্য, উঁট বা ছাগল-ভেঁড়ার রাখাল রৌদ্রে বা পিপাসায় যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে যতটুকু পরিমাণ পানাহার করা দরকার ততটুকু করে বাকী দিনটুকু সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিরত থাকবে। অতঃপর রমাযান বিদায় নিলে ঐ দিনটি কাযা করবে। আর এর জন্য কোন কাফ্ফারা নেই।(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ২৪/৬৭, ১০০, ফাসিঃ মুসনিদ ১০১-১০২পৃঃ)

অনুরূপ বিধান হল চাষী ও মজুরদের।(ফাসিঃ মুসনিদ ৬১পৃঃ)

পক্ষান্তরে যাদের প্রাত্যহিক ও চিরস্থায়ী পেশাই হল কঠিন কাজ; যেমন পাথর কাটা বা কয়লা ইত্যাদির খনিতে যারা কাজ করে এবং যারা আজীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত, তারা রোযা রাখতে অপারগ হলে তথা অস্বাভাবিক কষ্ট অনুভব করলে রোযা না রাখতে পারে। তবে তাদের জন্য (তাদের পরিবার দ্বারা) ফিদ্য়া আদায় (একটি রোযার বদলে একটি মিসকীনকে খাদ্য দান) করা জরুরী। অবশ্য এ কাজ সম্ভব না হলে তাও তাদের জন্য মাফ।(আহকামুস সাওমি অল-ই'তিকাফ, আবূ সারী মঃ আব্দুল হাদী ১২২পৃঃ)

পরীক্ষার সময় মেহনতী ছাত্রদের জন্য রোযা কাযা করা বৈধ নয়। কারণ, এটা কোন এমন শরয়ী ওযর নয়, যার জন্য রোযা কাযা করা বৈধ হতে পারে।(ইবনে বায, ফাসিঃ মুসনিদ ৮০পৃঃ, তাইঃ ৪৮পৃঃ)

1. দিন যেখানে অস্বাভাবিক লম্বাঃ

যে দেশে দিন অস্বাভাবিকভাবে ২০/২১ ঘণ্টা লম্বা হয়, সে দেশের লোকেদের জন্যও রোযা ত্যাগ করা অথবা সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করা বৈধ নয়। তাদের যখন দিন-রাত

হয়, তখন সেই অনুসারে তাদের জন্য আমল জরুরী; তাতে দিন লম্বা হোক অথবা ছোট। কেননা, ইসলামী শরীয়ত সকল দেশের সকল মানুষের জন্য ব্যাপক। আর মহান আল্লাহ ঘোষণা হল,

(وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)

অর্থাৎ, আর তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না (রাতের) কালো অন্ধকার থেকে ফজরের সাদা রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে। অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৭)

কিন্তু যে ব্যক্তি দিন লম্বা হওয়ার কারণে, অথবা নিদর্শন দেখে, অভিজ্ঞতার ফলে, কোন বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মতে, কিংবা নিজের প্রবল ধারণা মতে এই মনে করে যে, রোযা রাখাতে তার প্রাণ নাশ ঘটবে, অথবা বড় রোগ দেখা দেবে, অথবা রোগ বৃদ্ধি পাবে, অথবা আরোগ্য লাভে বিলম্ব হবে, সে ব্যক্তি ততটুকু পরিমাণ পানাহার করবে যতটুকু পরিমাণ করলে তার জান বেঁচে যাবে অথবা ক্ষতি দূর হয়ে যাবে। অতঃপর রমাযান বিদায় নিলে সুবিধা মত যে কোন মাসে ঐ দিনগুলো কাযা করে নেবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

(فَمَنْ شَهِدَ منْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر، يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোযা রাখে। কিন্তু কেউ অসুস্থ বা মুসাফির হলে সে অপর কোন দিন গণনা করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তিনি তোমাদের জন্য কঠিন কিছু চান না। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৫)

তিনি আরো বলেন,

(لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)

অর্থাৎ, আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সাধ্যের অতীত ভার অর্পণ করেন না। (কুরআনুল কারীম ২/২৮৬)

(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ)

অর্থাৎ, আল্লাহ দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি। (কুরআনুল কারীম ৫/৬, ২২/৭৮)

যে ব্যক্তি এমন দেশে বসবাস করে, যেখানে গ্রীষমকালে সূর্য অস্তই যায় না এবং শীতকালে উদয়ই হয় না, অথবা যেখানে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি থাকে, সে ব্যক্তির উপরেও রমাযানের রোযা ফরয। সে ব্যক্তি নিকটবর্তী এমন কোন দেশের হিসাব অনুযায়ী রমাযান মাসের শুরু ও শেষ, প্রাত্যহিক সেহরীর শেষ তথা ফজর উদয় হওয়ার সময় ও ইফতার তথা সূর্যাস্তের সময় নির্ধারণ করবে, যে দেশে রাত দিনের পার্থক্য আছে। অতএব সেখানেও ২৪ ঘণ্টায় দিবারাত্রি নির্ণয় করতে হবে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক এ কথা প্রমাণিত যে, একদা তিনি সাহাবাবর্গকে দাজ্জাল প্রসঙ্গে কিছু কথা বললেন। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কতদিন পৃথিবীতে অবস্থান করবে?' উত্তরে তিনি বললেন, ''চল্লিশ দিন; এক দিন এক বছরের সমান, একদিন এক মাসের সমান এবং একদিন এক সপ্তাহের সমান। বাকী দিনগুলো তোমাদের স্বাভাবিক দিনের মত।'' তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! যে দিনটি এক বছরের মত হবে, সে দিনে কি এক দিনের (৫ অক্ত) নামায পড়লে যথেষ্ট হবে?' তিনি বললেন, ''না। বরং তোমরা বছর সমান ঐ দিনকে স্বাভাবিক দিনের মত নির্ধারণ করে নিও।' (মুসলিম ২৯৩৭নং)'

বলা বাহুল্য, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ঐ এক বছর সমান দিনকে একটি স্বাভাবিক দিন গণ্য করেননি; যাতে কেবল ৫ অক্ত নামায যথেষ্ট হবে। বরং তাতে প্রত্যেক ২৪ ঘণ্টায় ৫ অক্ত নামায পড়া ফরয বলে ঘোষণা করেন। আর তাদেরকে তাদের স্বাভাবিক দিনের সময়ের দূরত্ব ও পার্থক্য হিসাব করে ঐ বছর সমান দিনকে ভাগ করতে আদেশ করেন। সুতরাং যে সকল মুসলিম সেই দেশে বাস করেন, যেখানে ৬ মাস দিন ও ৬ মাস রাত লম্বা হয়, সেখানে তাঁরা তাঁদের নামাযের সময়ও নির্ধারণ করবেন। আর এ ব্যাপারে নির্ভর করবেন তাঁদের নিকটবর্তী এমন দেশের, যেখানে রাত-দিন স্বাভাবিকরূপে চেনা যায় এবং প্রত্যেক ২৪ ঘন্টায় শরয়ী চিহ্ন মতে ৫ অক্ত নামাযের সময় জানা যায়। আর তদনুরূপই রমাযানের রোযা নির্ধারণ করতে হবে। কারণ, এ দিক থেকে রোযা ও নামাযের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৪/১২৬, ১৬/১১০, ২৫/১১, ২৯, ৩৪, ইবনে উষাইমীন ফাসিঃ মুসনিদ ৯৭-৯৮পৃঃ, ৪৮ঃ ৪৯পৃঃ

(৮) মুসাফির

মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে মুসাফিরের জন্য রোযা কাযা করা বৈধ; চাহে সে মুসাফির রোযা রাখতে সক্ষম হোক অথবা অক্ষম, রোযা তার জন্য কষ্টদায়ক হোক

অথবা না হোক, অর্থাৎ মুসাফির যদি ছায়া ও পানির সকল সুবিধা নিয়ে সফর করে এবং তার সাথে তার খাদেমও থাকে অথবা না থাকে, (সফর এরোপে½নে হোক অথবা পায়ে হেঁটে); যেমনই হোক তার জন্য রোযা কাযা করা ও নামায কসর করা বৈধ।(সাবঊনা মাসআলাহ ফিস্-সিয়াম ১৭পৃঃ)

মহান আল্লাহ বলেন,

(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر)

অর্থাৎ, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ বা মুসাফির হলে সে অপর কোন দিন গণনা করবে। *(কুরআনুল কারীম ২/১৮৪)*

অবশ্য সফরে রোযা কাযা করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি শর্ত রয়েছেঃ-

১। সফর পরিমাণ মত দূরত্বের হতে হবে। অর্থাৎ এমন সফর হতে হবে, যাকে পরিভাষায় সফর বলা হয়। আর সঠিক মত এই যে, সফর চিহ্নিত করার জন্য কোন নির্দিষ্ট মাপের দূরত্ব নেই। এ ব্যাপারে প্রচলিত অর্থ ও পরিভাষার সাহায্য নিতে হবে।(আশশারহুল মুমতে' ৪/৪৯৭-৪৯৮)

তদনুরূপ স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্য না হলে নির্দিষ্ট দিন অবস্থান করার ব্যাপারে কোন সীমাবদ্ধতা নেই।(ঐ ৪/৫৩২-৫৩৭ দ্রঃ)

ইবনে উমার (রাঃ) আযারবাইজানে ৬ মাস থাকা কালে কসর করে নামায পড়েছেন।(বাইহাকী ৩/১৫২, ইরওয়াউল গালীল, আলবানী ৫৭৭, ৩/১৬, ইবনে উষাইমীন ফাসিঃ জিরাইসী ২৫পৃঃ)

সুতরাং যে ব্যক্তি কোন স্থানে সফর করার পর কিছুকাল বাস করে, কিন্তু সে সেখানে স্থায়ী বসবাসের নিয়ত করে না; বরং যে উদ্দেশ্যে সফর করেছে সে উদ্দেশ্য সফল হলেই সবগৃহে ফিরে যাওয়ার সংকল্প পোষণ করে, সে ব্যক্তি মুসাফির। সে মুসাফিরের সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন স্থানে সফর করার পর সে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে, সে ব্যক্তিকে মুসাফির বলা যাবে না। সে হল প্রবাসী এবং তার জন্য রোযা কাযা করা জায়েয নয়। বরং তার জন্য রোযা রাখা ওয়াজেব। বলা বাহুল্য, যে ছাত্ররা বিদেশে পড়াশোনা করার উদ্দেশ্যে সফর করে নির্দিষ্ট কয়েক মাস বা বছর ধরে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, সে ছাত্ররা মুসাফির নয়। তাদের জন্য রোযা কাযা করা বৈধ নয়।

২। মুসাফির যেন নিজের গ্রাম বা শহরের ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে গ্রাম বা শহরের বাইরে এসে রোযা ভাঙ্গে। আনাস (রাঃ) বলেন, 'আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-

এর সাথে (মক্কা যাওয়ার পথে) মদ্বীনায় যোহরের ৪ রাকআত এবং (মদ্বীনা থেকে ৬ মাইল দূরে) যুল-হুলাইফায় গিয়ে আসরের ২ রাকআত পড়তাম।(বুখারী ১০৮৯নং, মুসলিম ৬৯০, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ)'

বলা বাহুল্য, সফর করতে শহর বা গ্রাম ত্যাগ করার পূর্ব থেকেই নামায কসর করা চলবে না। অনুরূপ রোযাও শহর বা গ্রাম সম্পূর্ণ ত্যাগ করার পূর্বে ভাঙ্গা চলবে না। কারণ, নিজ গ্রাম বা শহরের জনপদে থাকা অবস্থাকে সফর বলা যায় না এবং সফরকারীর জন্য মুসাফির নাম সার্থক হয় না।(আশশারহুল মুমতে' ৬/৩৫৮-৩৫৯)

বুঝা গেল যে, মুসাফির যখন সফরের উদ্দেশ্যে নিজ গ্রাম বা শহরের আবাসিক এলাকা ত্যাগ করবে, তখনই তার জন্য রোযা ভাঙ্গা বৈধ হবে। তদনুরূপ এয়ারপোর্ট শহরের ভিতরে হলে এরোপে½ন শহর ছেড়ে আকাশে উড়ে গেলে রোযা ভাঙ্গা বৈধ হবে। অবশ্য এয়ারপোর্ট শহরের বাইরে হলে সেখানে রোযা ভাঙ্গা বৈধ। আর শহরের ভিতরে হলে অথবা শহরের লাগালাগি হলে সেখানে রোযা ভাঙ্গা বৈধ নয়। কারণ, তখনও সফরকারী নিজ শহরের ভিতরেই থাকে।

যারা রমাযান মাসে সফর করার ইচ্ছা করে এবং রোযা কাযা করতে চায় তাদের জন্য একটি সতর্কতার বিষয় এই যে, গ্রাম বা শহর ছেড়ে সফর করে না যাওয়া পর্যন্ত যেন তারা রোযা ভাঙ্গার নিয়ত না করে। কারণ, ভাঙ্গার নিয়ত করলে রোযা হবে না। আর নিয়তের পর যদি কোন প্রতিবন্ধকতা বা কারণবশতঃ সফর না করা হয়, তাহলে তার জন্য রোযা ভাঙ্গা বৈধ হবে না।(সাবঊনা মাসআলাহ ফিস্-সিয়াম ১৮নং)

৩। মুসাফিরের সফর যেন কোন অবৈধ কাজের জন্য না হয়। (অধিকাংশ উলামার মত এটাই।) কেননা পাপ-সফরে শরয়ী সুযোগ-সুবিধা নেওয়ার অধিকার পাপী মুসাফিরের নেই। যেহেতু ঐ সুযোগ-সুবিধা হল ভারপ্রাপ্ত বান্দার উপর কিছু ভার সহজ ও হাল্কা করার নামান্তর। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করে হারাম কাজের জন্য সফর করে সে ব্যক্তি আল্লাহর দেওয়া ঐ সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকার পেতে পারে না।(আশশারহুল মুমতে' ৪/৪৯২)

৪। সফরের উদ্দেশ্য যেন রোযা না রাখার একটা বাহানা না হয়। কারণ, ছল-বাহানা করে আল্লাহর ফরয বাতিল হয় না।(ফুসূলুন ফিস্-সিয়ামি অত্-তারাবীহি অয্-যাকাহ, ইবনে উষাইমীন ১০পৃঃ)

যে সফরে রোযা কাযা করার অনুমতি আছে সে সফর হজ্জ, উমরাহ, কোন আপনজনকে দেখা করার উদ্দেশ্যে কিংবা ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে সাময়িক হোক, অথবা (ভাড়া গাড়ির

ড্রাইভারের মত) সার্বক্ষণিক হোক, তাতে কোন পার্থক্য নেই। বলা বাহুল্য, যে সর্বক্ষণ সফরে থাকে, তার যদি ফিরে এসে আশ্রয় নেওয়ার মত বাসভূমি থাকে, অর্থাৎ, (উড়িয়া যাযাবরদের মত) তার পরিবার-পরিজন তার সাথে না থাকে, যেমন; পিওন, যে মুসলিমদের ডাক বহন করার উদ্দেশ্যে সফর করে। যেমন, ভাড়া গাড়ির ড্রাইভার, ট্রেন বা পে½নের পাইলট ও খালাসী-হোস্টেস ইত্যাদি - যদিও তাদের সফর প্রাত্যহিক হয়, তবুও তাদের জন্য রোযা কাযা করা বৈধ। অবশ্য এ রোযা তারা সময় মত পরিশোধ করতে বাধ্য হবে। তদনুরূপ পানি-জাহাজের মাল্লা, যার স্থলে বাসস্থান আছে (অর্থাৎ, জাহাজই তার স্থায়ী বাসস্থান নয়), সেও কাযা করতে পারে।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তি সকলের কাজ যেহেতু নিরবচ্ছিন্ন ও বিরতিহীন, সেহেতু তারা শীতকালে কাযা করে নিতে পারে। কারণ, শীতের দিন ছোট ও ঠান্ডা। সে সময় কাযা তুলতে কষ্ট হবে না। কিন্তু তারা যদি রমাযান মাসে সবগৃহে ফিরে আসে তাহলে সেখানে থাকা কালে তাদের জন্য রোযা রাখা জরুরী।

পক্ষান্তরে শহরের ভিতরে চলমান ট্রেন, বাস, ট্যাক্সি, অটো-রিক্সা প্রভৃতির ড্রাইভার মুসাফির নয়। কারণ, তারা সফরের দূরত্ব অতিক্রম করে না। তাই তাদের জন্য যথাসময়ে রোযা রাখা ওয়াজেব।(আশশারহুল মুমতে’ ৪/৫৩৯-৫৪০, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/১৪৪, ইবনে উষাইমীন ফাসিঃ মুসনিদ ৭৪পৃঃ)

শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সৈনিক ও মুজাহেদ সফরের সেই পরিমাণ দূরত্ব সফর করলে রোযা কাযা করতে পারে, যে পরিমাণ সফর করলে নামায কসর করা বৈধ। অবশ্য তারাও রমাযান পরে কাযা তুলতে বাধ্য হবে। আর যদি তারা মুসাফির না হয়, বরং শত্রু তাদেরকে তাদের অবস্থান ক্ষেত্রে আক্রমণ করে, তাহলে যে জিহাদের সাথে রোযা রাখতে সক্ষম হবে তার জন্য রোযা রাখা ওয়াজেব। কিন্তু যে রোযা রাখার সাথে সাথে জিহাদের ‘ফর্যে আইন’ আদায় করতে সক্ষম নয়, তার জন্য কাযা করা বৈধ। তবে রমাযান শেষ হওয়ার পর ছুটে যাওয়া রোযা অবশ্যই সে রেখে নেবে।(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/১৪১, ফাসিঃ মুসনিদ ৭৫পৃঃ, ইতহাফু আহলিল ইসলাম বিআহকামিস সিয়াম ২৬পৃঃ) [11]

মুসাফিরের জন্য রোযা রাখা ভালো, না কাযা করা ভালো?

সফরে মুসাফিরের ৩ অবস্থা হতে পারেঃ- এই অবস্থাগুলির বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, আশশারহুল মুমতে’ ৬/৩৩৯, ৩৫৫-৩৫৬, ফুসূলুন ফিস্-সিয়ামি অত্-তারাবীহি অয্-যাকাহ, ইবনে উষাইমীন ১০-১১পৃঃ, ফাসিঃ ইবনে উষাইমীন ১৮-২০পৃঃ, ফ মুসনিদ

৭০-৭১পৃঃ)

১। রোযা তার জন্য কষ্টকর নয়। এমন অবস্থায় রোযা রাখা বা কাযা করার মধ্যে যেটা তার জন্য সহজ ও সুবিধা হবে, সেটাই সে করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

(يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তিনি তোমাদের জন্য কঠিন কিছু চান না। *(কুরআনুল কারীম ২/১৮৫)*

হামযাহ বিন আম্র আসলামী মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে সফরে রোযা রাখা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বললেন, ‘‘তোমার ইচ্ছা হলে তুমি রোযা রাখ, আর ইচ্ছা না হলে রেখো না।’’ (বুখারী **১৯৪৩**, মুসলিম **১১২১**নং)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, ‘আমরা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে **১৭ই** রমাযান এক যুদ্ধ-সফরে ছিলাম। আমাদের মধ্যে কারো রোযা ছিল, কারো ছিল না। কিন্তু যার রোযা ছিল সে তার নিন্দা করেনি যার রোযা ছিল না এবং যার রোযা ছিল না সেও তার নিন্দা করেনি যার রোযা ছিল।’ আর এক বর্ণনায় আছে, তাঁরা মনে করতেন যে, যার ক্ষমতা আছে, তার জন্য রোযা রাখা ভাল। আর যার দুর্বলতা আছে তার জন্য রোযা না রাখা ভাল।(মুসলিম **১১১৬**নং)

কিন্তু যদি উভয় এখতিয়ার সমান হয়; অর্থাৎ, রোযা রাখার উপর কাযা করাকে প্রাধান্য দেওয়ার মত কোন বৈশিষ্ট্য না থাকে এবং রোযা কাযা করার উপর রাখাকে প্রাধান্য দেওয়ার মত কোন বৈশিষ্ট্য না থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় নিম্নে উল্লেখিত দলীলের ভিত্তিতে তার জন্য রোযা রাখাই উত্তমঃ-

(ক) এটি হল আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর আমল। আবূ দারদা (রাঃ) বলেন, ‘আমরা এক রমাযান মাসের কঠিন গরমের দিন (সফরে) ছিলাম। এমনকি আমাদের কেউ কেউ গরমের কারণে মাথায় হাত রেখেছিল। আর আমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ ছাড়া অন্য কারো রোযা ছিল না।’ (বুখারী **১৯৪৫**, মুসলিম **১১২২**নং)

(খ) রোযা রাখাতে সত্বর দায়িত্ব পালন হয়। কারণ, পরে কাযা করাতে বিলম্ব হয়। আর রমাযানে রোযা রেখে নিলে আগে আগে ফরয আদায় হয়ে যায়।

(গ) মুসলিমের জন্য রমাযানে রোযা রাখাটাই সাধারণতঃ বেশী সহজ। কেননা, পরে একাকী নতুন করে রোযা রাখার চাইতে লোকেদের সাথে রোযা ও ঈদ করে নেওয়াটাই বেশী সহজ। যেমন এ কথা সকলের নিকট পরীক্ষিত ও বিদিত।

(ঘ) রোযা রাখলে মাহাত্ম্যপূর্ণ সময় পাওয়া যায়; আর তা হল রমাযান। পরন্তু রমাযান হল অন্যান্য মাসের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর। যেহেতু সেটাই হল রোযা ওয়াজেব হওয়ার সময়। (আশশারহুল মুমতে’ ৬/৩৫৬)

২। রোযা তার জন্য কষ্টকর, তবে বেশী নয়। বরং রোযা না রাখাটাই তার জন্য সুবিধা ও আরামদায়ক। এমন অবস্থায় মুসাফিরের রোযা রাখা মকরূহ এবং রোযা না রাখা উত্তম। কারণ, অনুমতি থাকা সত্ত্বেও কষ্ট স্বীকার করার অর্থ হল, মহান আল্লাহর অনুমতিকে উপেক্ষা করা।

আবার সফরে কখনো রোযা না রাখাটা উত্তম ও অধিক সওয়াব লাভের কারণ হতে পারে; যদি মুসাফির কোন কর্ম-দায়িত্ব পালন করে তাহলে। আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) (সাহাবা সহ) এক সফরে ছিলেন। তাঁদের কিছু লোক রোযা রাখল এবং কিছু রাখল না। যারা রোযা রাখেনি তারা বুদ্ধি করে রোযা ভাঙ্গল এবং কাজ করল। আর যারা রোযা রেখেছিল তারা কিছু কাজ করতে দুর্বল হয়ে পড়ল। তা দেখে তিনি বললেন, “আজ যারা রোযা রাখেনি তারাই সওয়াব কামিয়ে নিল।” (বুখারী ২৮৯০, মুসলিম ১১১৯নং, আর হাদীসের শব্দাবলী তাঁরই, নাসাঈ)

৩। অসহ্য গরম, খারাপ বা দূরবর্তী রাস্তা অথবা অবিশ্রাম পথ চলার কারণে রোযা তার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়। এ অবস্থায় তার জন্য রোযা রাখা হারাম। কারণ, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মক্কা-বিজয় অভিযানে রোযা রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে খবর এল যে, লোকেরাও রোযা রেখেছে, আর এর ফলে তারা কষ্ট ভুগছে এবং তিনি কি করছেন তা জানার অপেক্ষা করছে। সুতরাং আসরের পর তিনি এক পাত্র পানি আনিয়ে পান করলেন। লোকেরা এ দৃশ্য তাকিয়ে দেখতে লাগল। তাঁকে বলা হল, কিছু লোক রোযা অবস্থায় আছে। তিনি বললেন, “তারা নাফরমান, তারা অবাধ্য।” (মুসলিম ১১১৪নং)

জাবের (রাঃ) বলেন, একদা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এক সফরে ছিলেন। তিনি দেখলেন লোকেরা একটি লোককে ঘিরে জমা হয়েছে এবং লোকটির উপর ছায়া করা হয়েছে। তিনি বললেন, “কি হয়েছে ওর?” লোকেরা বলল,

‘লোকটি রোযা রেখেছে।’ তিনি বললেন, “সফরে তোমাদের রোযা রাখা ভাল কাজ নয়।” (বুখারী ১৯৪৬, মুসলিম ১১১৫নং এবং শব্দাবলী তাঁরই)

কখনো কোন ইমারজেন্সী কারণে রোযা ভাঙ্গা ওয়াজেবও হতে পারে। যেমন আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা রোযা রাখা অবস্থায় আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে মক্কা সফর করলাম। এক মঞ্জিলে নেমে তিনি বললেন, “তোমরা এখন শত্রুর সম্মুখীন হয়েছ, আর রোযা না রাখাতে তোমাদের শক্তি বেশী হবে।” এ কথার ফলে রোযা না রাখাতে অনুমতি হল। তখন আমাদের মধ্যে কেউ রোযা বাকী রাখল, কেউ ভেঙ্গে ফেলল। অতঃপর আমরা আর এক মঞ্জিলে অবতরণ করলাম। সেখানে তিনি বললেন, “সকালে তোমাদের শত্রুদের সাথে সাক্ষাৎ হবে। আর রোযা না রাখাতে তোমাদের ক্ষমতা বেশী থাকবে। অতএব তোমরা রোযা ভেঙ্গে দাও।” এক্ষণে তা বাধ্যতামূলক ছিল। ফলে আমরা সকলে রোযা ভেঙ্গে দিলাম।

আবূ সাঈদ (রাঃ) আরো বলেন, কিন্তু এর পরে আমরা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সফরে রোযা রাখতাম।(মুসলিম ১১২০নং)

i. **মাসআলাঃ**

রোযা রেখে স্বামী-স্ত্রী এক সাথে সফর করে সফরে দিনের বেলায় সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে পড়লে কোন ক্ষতি নেই। কারণ, মুসাফিরের জন্য রোযা ভাঙ্গা বৈধ। অতএব সে কিছু খেয়ে, অথবা পান করে অথবা সঙ্গম করে রোযা ভাঙ্গতে পারে। এ সব কিছুই তার জন্য হালাল। বলা বাহুল্য, ঐ রোযা কাযা করা ছাড়া তার জন্য অন্য কিছু ওয়াজেব নয়।(আশশারহুল মুমতে’ ৬/৩৫৯, ইবনে জিবরীন ফাসিঃ জিরাইসী ১২পৃঃ)

i. **মাসআলাঃ**

দিন থাকতে মুসাফির ঘরে ফিরে এলে এবং অনুরূপ সেই সকল ওযর-ওয়ালা মানুষ যাদের যে ওযরের কারণে রোযা ভাঙ্গা বৈধ ছিল তাদের সেই ওযর দূর হলে দিনের বাকী অংশটা পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে কি না - এ বিষয়ে উলামাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

কিছু উলামা মনে করেন, ওয়াজেব হওয়ার কারণ নতুনভাবে দেখা দিলে রোযা ভঙ্গকারী জিনিস থেকে বিরত থাকা ওয়াজেব। আর সেই দিনের রোযা কাযা করা ওয়াজেব নয়। যেমন রোযার দিনে কোন কাফের মুসলিম হলে, নাবালক সাবালক হলে অথবা পাগল সুস্থ হলে, সে বাকী দিন পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে এবং তাকে ঐ দিনটি কাযা করতে হবে না।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন প্রতিবন্ধকতার ফলে রোযা রাখেনি তার সে প্রতিবন্ধকতা দিনের মধ্যে দূর হলে তাকে বাকী দিন পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা ওয়াজেব নয়; অবশ্য ঐ দিনের রোযা কাযা ওয়াজেব। যেমন দিন থাকতে নিফাস বা ঋতুমতী মহিলা পবিত্রা হলে, মুসাফির রোযা না রেখে ঘরে ফিরলে, রোগী সুস্থ হলে এবং নিরপরাধ প্রাণ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে যে রোযা ভেঙ্গেছিল তার সে কাজ শেষ হলে বাকী দিন পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা ওয়াজেব নয়। কিন্তু ঐ দিনের কাযা অবশ্যই ওয়াজেব।(আশশারহুল মুমতে' ৪/৫৪০-৫৪১, ৬/৩৪৭, ৩৬৩, ৪২০)

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি দিনের প্রথম ভাগে রোযা রাখেনি, তার উচিৎ দিনের শেষভাগে রোযা না রাখা। (পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত না হওয়া।)' (ইবনে আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ ৯৩৪৩নং) [12]

অন্য দিকে অপর কিছু উলামা মনে করেন, উপর্যুক্ত সকল প্রকার লোকের জন্য বাকী দিন পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা ওয়াজেব।(ইবনে জিবরীন ফাসিঃ মুসনিদ ৭৪পৃঃ)

অবশ্য উত্তম ও পূর্বসতর্কতামূলক কাজ এই যে, ঐ শ্রেণীর সকল লোকই রমাযান মাসের মর্যাদার কথা খেয়াল রেখে এবং উক্ত মতভেদ থেকে দূরে থেকে বাকী দিনটি পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে।(আহকামুস সাওমি অল-ই'তিকাফ, আবূ সারী মঃ আব্দুল হাদী ৬৪পৃঃ, সাবঊনা মাসআলাহ ফিস্-সিয়াম ২৩নং)

চতুর্থ অধ্যায়: রোযার গুরুত্ব ও ফজিলত

রোযা কেবল খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকা নয়, এটি একটি আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও শারীরিক পরিশীলনের মাধ্যম। ইসলামী শিক্ষায় রোযার গুরুত্বকে বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

রমযনের রোযা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম। ঈমান, নামায ও যাকাতের পরই রোযার স্থান। রোযার আরবি শব্দ সওম, যার আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। পরিভাষায় সওম বলা হয়-প্রত্যেক সজ্ঞান, বালেগ মুসলমান নর-

নারীর সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও রোযাভঙ্গ কারী সকল কাজ থেকে বিরত থাকা। সুতরাং রমযান মাসের চাঁদ উদিত হলেই প্রত্যেক সু স্থ, মুকীম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং হায়েযনেফাসমুক্ত প্রাপ্তবয়স্কা নারীর উপর পূর্ণ রমযান রো যা রাখা ফরয। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(তরজমা) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হ য়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।-সূরা বাকারা (২) : ১৮৩

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

(তরজমা) সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে।- সূরা বাকারা (২) : ১৮৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছে ন-

إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين،
وفي رواية : صوموا لرؤيته وأفطروا لرويته، فإن عم عليكم فاكملوا العدد.

যখন তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা রাখবে আর যখন (শাওয়ালের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা বন্ধ করবে। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে ত্রিশ দিন রোযা রাখবে।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১০৮০ (১৭-১৮)

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস এবং এ বিষয়ক অন্যান্য দলীলের আলোকে প্রমাণিত যে, রমযা ন মাসের রোযা রাখা ফরয, ইসলামের আবশ্যক বিধানরূপে রোযা পালন করা ও বিশ্বাস ক রাও ফরয।

তাছাড়া কোনো শরয়ী ওযর ছাড়া কোন মুসলমান যদি রমযান মাসের একটি রোযাও ইচ্ছা কৃতভাবে পরিত্যাগ করে তাহলে সে বড় পাপী ও জঘন্য অপরাধীরূপে গণ্য হবে। দ্বীনের মৌলিক বিধান লঙ্ঘনকারী ও ঈমান-

ইসলামের ভিত্তি বিনষ্টকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। হাদীস শরীফে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগকারী ও ভঙ্গকারীর জন্য কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু উমামা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শু নেছি,

بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيابي جبلا وعرا فقالا : اصعد؛ فقلت : إني لا أطيقه. فقالا: سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت : ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة اشداقهم، تسيل اشداقهم دما. قال : قلت : من هؤلاء : قال : الذين يفطرون قبل تحلة صومهم.

رواه الحاكم فى المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمى فى المجمع (240)، وقال : رجاله رجال الصحيح

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম আমার নিকট দুই ব্যক্তি আগমন করল। তারা আমার বাহুদ্বয় ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে এল। তারপর আমাকে বলল, আপনি পাহা ড়ের উপর উঠুন। আমি বললাম, আমি তো উঠতে পারব না। তারা বলল, আমরা আপনাকে সহজ করে দিব। আমি উপরে উঠলাম। যখন পাহাড়ের সমতলে পৌঁছালাম, হঠাৎ ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এ সব কিসের আওয়াজ? তারা বলল, এটা জাহা ন্নামীদের আর্তনাদ। তারপর তারা আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ কিছু লোক দেখতে পেলাম, যাদেরকে তাদের পায়ের মাংসপেশী দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এবং তাদের মুখে র দুই প্রান্ত ছিড়ে ফেলা হয়েছে এবং তা থেকে রক্ত ঝরছে। আমি বললাম, এরা কারা? তা রা বলল, যারা ইফতারের সময় হওয়ার আগেই রোযা ভেঙ্গে ফেলে।-

সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৯৮৬; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৭৪৪৮; সুনানে নাসা য়ী কুবরা, হাদীস : ৩২৮৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস-১৬০৯; তবারানী, হাদীস : ৭৬৬৬

রমযান মাসের একদিন রোযা না রাখলে মানুষ শুধু গুনাহগারই হয় না, ঐ রোযার পরিবর্তে আজীবন রোযা রাখলেও রমযানের এক রোযার যে মর্যাদা ও কল্যাণ, যে অনন্ত রহমত ও খায়ের-

বরকত তা কখনো লাভ করতে পারবে না এবং কোনোভাবেই এর যথার্থ ক্ষতিপূরণ আদায় হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

من افطر يوما من رمضان متعمدا من غير سفر ولا مرض لم يقضه ابدا، وان صام الدهر كله، ... وقد ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم حيث قال : وبه قال ابن مسعود، وقال الشيخ محمد عوامه : وهذا الحديث موقوف لفظا ومرفوع حكما

যে ব্যক্তি অসুস্থতা ও সফর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের একটি রোযাও ভঙ্গ করে, সে আজীবন রোযা রাখলেও ঐ রোযার হক আদায় হবে না।-

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৮৯৩; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস : ৭৪৭৬; সহীহ বুখারী ৪/১৬০

হযরত আলী রা. বলেন-

من افطر يوما من رضمان متعمدا لم يقضه أبدا طول الدهر.

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযান মাসের একটি রোযা ভঙ্গ করবে, সে আজীবন সেই রোযার (ক্ষতিপূরণ) আদায় করতে পারবে না।- মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৮৭৮

হাদীস শরীফে বর্ণিত রোযার কিছু ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হলো :

১. রোযার প্রতিদান আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজেই দিবেন এবং বিনা হিসাবে দিবেন

প্রত্যেক নেক আমলের নির্ধারিত সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমলকারীকে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু রোযার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ রোযার বিষ য়ে আছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এক অনন্য ঘোষণা।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ক রেছেন,

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى : الا الصوم فإنه لى وانا أجزى به يدع شهوته وطعامه من أجلى.

মানুষের প্রত্যেক আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করা হয়। একটি নেকীর সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতাশ গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, কিন্তু রোযা আলাদা। কেননা তা একমা ত্র আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর বিনিময় প্রদান করব। বান্দা একমাত্র আমার জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে।-

সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৪); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৭১৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৮৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৩৮

অন্য বর্ণনায় আছে-

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله : يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلى، الصيام لى وانا اجزى به، والحسنة بعشر امثالها.

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, বান্দা একমাত্র আমার জন্য তার পানাহার ও কামাচার বর্জন করে, রোযা আমার জন্যই, আমি নিজেই তার পুরস্কার দিব আর (অন্যান্য) নেক আমলের বিনিময় হচ্ছে তার দশগুণ।-

সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৪; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৯৯৯; মুয়াত্তা মালেক ১/৩১০

রোযা বিষয়ে-অন্য বর্ণনায়-আললাহ তাআলা বলেন,

“প্রত্যেক ইবাদতই ইবাদতকারী ব্যক্তির জন্য, পক্ষান্তরে রোযা আমার জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। (সহীহ বুখারী হাদীস-১৯০৪)

এ কথার তাৎপর্য হল, যদিও প্রকৃতপক্ষে সকল ইবাদতই আল্লাহর জন্য, তার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। তবুও রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। তা হল-অন্যান্য সকল ইবাদতের কাঠামোগত ক্রিয়াকলাপ, আকার-আকৃতি ও নিয়ম পদ্ধতি এমন যে, তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়াও ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের সুযোগ বিদ্যমান থাকে। মুখে প্রকাশ না করলেও অনেক সময় তার অন্তরে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব সৃষ্টি হতে পারে। তার অনুভূতির অন্তরালে এ ধরনের ভাব লুকিয়ে থাকে। তা সে অনুভব করতে না পারলেও তার ভিতরে অবচেতনভাবে বিদ্যমান থাকে। ফলে সেখানে নফসের প্রভাব এসে যায়। পক্ষান্তরে রোযা এমন এক পদ্ধতিগত ইবাদত, তার-আকার-

আকৃতি এরূপ যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। রোযাদার ব্যক্তি নিজ মুখে রোযার বিষয়টি প্রকাশ না করলে সাধারণত তা আলেমুল গায়েব আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কারো নিকট প্রকাশিত হওয়ার মত নয়। তাই রোযার ক্ষেত্রে মাওলার সন্তুষ্টির বিষয়টি একনিষ্ঠভাবে প্রতিভাত হয়। একারণেই রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মাঝে এরূপ বিস্তর ব্যবধান।

রোযার এত বড় ফযীলতের কারণ এটাও হতে পারে যে, রোযা ধৈর্য্যের ফলস্বরূপ। আর ধৈর্য্যধারণকারীদের জন্য আল্লাহ তাআলার সুসংবাদ হল-

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

ধৈর্য্যধারণকারীগণই অগণিত সওয়াবের অধিকারী হবে।-সূরা যুমার (৩৯) : ১০

সব মাখলুকের স্রষ্টা, বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, আল্লাহ তাআলা নিজেই যখন এর পুরস্কার দিবেন, তখন কী পরিমাণ দিবেন? ইমাম আওযায়ী রাহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন- আল্লাহ যে রোযাদারকে প্রতিদান দিবেন, তা মাপা হবে না, ওজন করা হবে না অর্থাৎ বিনা হিসাবেই দিবেন।

২. আল্লাহ তাআলা রোযাদারকে কেয়ামতের দিন পানি পান করাবেন

হযরত আবু মুসা রা. হতে বর্ণিত,

ان الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من اعطش نفسه له في صائف سقاه يوم العطش،

رواه البزار، وذكره الهيثمي في المجمع (5095)، وقال : رواه البزار، ورجاله موثقون.
وقال المنذري في الترغيب (1478)، : إسناده حسن، ان شاء الله.

আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজের উপর অবধারিত করে নিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার সন্তুষ্টির জণ্য গ্রীষ্মকালে (রোযার কারণে) পিপাসার্ত থেকেছে, তিনি তাকে তৃষ্ণার দিন (কিয়ামতের দিন) পানি পান করাবেন।-

মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১০৩৯; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

قال الله تعالى : الصيام لى وانا اجزى به ... فان لهم يوم القيامة حوضا ما يرده غير الصائم،

رواه البزار وذكره الهيثمي في المجمع، (5093)، وقال : رواه البزار، ورجاله موثقون.

আল্লাহ তাআলা বলেন, রোযা আমার জন্য, আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। কেয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য একটি বিশেষ পানির হাউজ থাকবে, যেখানে রোযাদার ব্যতীত অন্য কারো আগমন ঘটবে না।-

মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ৮১১৫; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৩

৩. রোযা হল জান্নাত লাভের পথ

عن حذيفة رضي الله عنه قال : اسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فقال : من قال : لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به، دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ختم له بها، دخل الجنة، رواه احمد، وذكره الهيثمى فى المجمع (11935) وقال : رواه احمد ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن مسلم البتى وهو ثقة، فالحديث صحيح كما قاله الشيخ احمد شاكر والشيخ شعيب الارنؤوط.

হযরত হুযায়ফা রা. বলেন, আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার বুকের সাথে মিলিয়ে নিলাম, তারপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় একদিন রোযা রাখবে, পরে তার মৃত্যু হয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো দান-সদকা করে তারপর তার মৃত্যু হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।-

মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩৩২৪; মুসনাদে বাযযার, হা.২৮৫৪

عن أبي أمامة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت : مرني بعمل يدخلني الجنة، قال : عليك بالصوم، فانه لا عدل له، ثم أتيته الثانية، فقال لي : عليك بالصيام.

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আগমন করে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যার দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বলেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। আমি পুনরায় তার নিকট এসে একই কথা বললাম। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ।-

মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪৯; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৮৯৩; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৬; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৩০

৪. রোযাদারগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে 'রাইয়ান' নামক বিশেষ দরজা দিয়ে

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إن فى الجنة بابا يقال له الريَّان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال : اين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فاذا دخلوا اغلق، فلم يدخل منه احد.

জান্নাতে একটি দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে কেবল রোযাদার ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে। অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে - কোথায় সেই সৌভাগ্যবান রোযাদারগণ? তখন তারা উঠে দাড়াবে। তারা ব্যতীত কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। অতঃপর রোযাদারগণ যখন প্রবেশ করবে, তখন তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।-

সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫২; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮১৮

হযরত সাহল ইবেন সা'দ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

ان للصائمين بابا فى الجنة يقال له : الريان، لا يدخل منه غيرهم اذا دخل آخرهم اغلق، ومن دخل منه شرب، ومن شرب منه لم يظمأ ابدًا.

قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب.

জান্নাতে রোযাদার ব্যক্তিদের জন্য একটি বিশেষ দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। রোযাদারগণ ছাড়া অন্য কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। যখন সর্বশেষ রোযাদার ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে, তখন সেই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, সে (জান্নাতের পানীয়) পান করবে। আর যে পান করবে, সে কখনো পিপাসার্ত হবে না।-

মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮৪২; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস : ১৯০২; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৭৬৫; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৪৪

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لكل اهل عمل باب من ابواب الجنة يدعون منه بذلك العمل، ولاهل الصيام باب يدعون منه، يقال له : الريان، فقال أبو بكر : يا رسول الله، هل احد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال : نعم، وارجو أن تكون منهم يا ابا بكر،

প্রত্যেক প্রকারের নেক আমলকারীর জন্য জান্নাতে একটি করে বিশেষ দরজা থাকবে, যার যে আমলের প্রতি অধিক অনুরাগ ছিল তাকে সে দরজা দিয়ে আহবান করা হবে। রোযাদারদের জন্যও একটি বিশেষ দরজা থাকবে, যা দিয়ে তাদেরকে ডাকা হবে, তার নাম হবে 'রাইয়ান'। আবু বকর রা. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন কেউ কি হবেন, যাকে সকল দরজা থেকে আহবান করা হবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি আশা রাখি তুমিও তাদের একজন হবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৮০০; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস : ৩২৬২৮

এ সম্পর্কে বুখারী-

মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب

الصدقة، فقال أبو بكر : بأبي أنت وأمي، يا رسول الله! ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال : نعم، وأرجو أن تكون منهم.

(সহীহ বুখারী, হাদীস-১৮৯৬, ৩৬৬৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০২৭ (৮৫-৮৬); মুসনাদে আহমাদ, হাদীস-৭৬৩৩; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস -৩০৯)

৫. রোযা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল ও দুর্গ

হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قال ربنا عز وجل : الصيام جنة يستجن بها العبد من النار وهو لى وانا أجزى به.
وهذا حديث صحيح بطرقه وشواهده، قاله الشيخ شعيب الارنؤوط

আমাদের মহান রব ইরশাদ করেছেন- রোযা হল ঢাল। বান্দা এর দ্বারা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। রোযা আমার জন্য আর আমিই এর পুরস্কার দিব।-

মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৪৬৬৯; শুয়াবুল ঈমান বাইহাকী, হাদীস : ৩৫৭০

উসমান ইবনে আবিল আস রা. বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

الصيام جنة من النار كجنة احدكم من القتال،

রোযা হল জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের (শত্রুর আঘাত হতে রক্ষাকারী) ঢালের মত।-

মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৬২৭৮; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২১২৫; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৬৪৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৩৯

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصيام جنة، وحصن حصين من النار

রোযা হল (জাহান্নাম থেকে পরিত্রান লাভের) ঢাল এবং সুরক্ষিত দুর্গ।-

মুসনাদে আহমদ, হাদীস-৯২২৫; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান, হাদীস-৩৫৭১

৬. রোযা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام : اى رب منعته الطعام والشهوة فشفعنى فيه، ويقول القرآن : منعته النوم بالليل، فشفعنى فيه، قال : فيشفعان له.

رواه أحمد، والحاكم فى المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي فى المجمع، وقال : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير، ورجال الطبرانى رجال الصحيح.

রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে রব! আমি তাকে খাদ্য ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি,
(অর্থাৎ না ঘুমিয়ে সে তেলাওয়াত করেছে) অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।-
মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৬৬২৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ২০৮০; বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান, হাদীস : ১৯৯৪

৭. রোযাদারের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।- সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৮, ২০১৪; সহীহ মুসলিম ৭৬০(১৬৫); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭১৭০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৬৮
হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ان الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه.

আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রমযানের রোযা ফরয করেছেন, আর আমি কিয়ামুল লাইল অর্থাৎ তারাবীহ'র নামাযকে সুন্নত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম ও কিয়াম আদায় করবে, সে ঐ দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে যেদিন সে মায়ের গর্ভ থেকে সদ্যভূমিষ্ঠ হয়েছিল।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস-১৬৬০, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস-৭৭৮৭, মুসনাদে বাযযার, হাদীস-১০৪৮, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস-২২০১, সুনানে নাসায়ী, হাদীস-২৫১৮

৮. রোযা গুনাহের কাফফারা

রোযা গুনাহের কাফফারা হওয়া কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন প্রকার গুনাহের কাফফারা স্বরূপ রোযার বিধান নাযিল করেছেন। যেমন ইহরাম অবস্থায় (অসুস্থতা বা মাথার কষ্টের কারণে) মাথা মুন্ডানোর কাফফারা স্বরূপ (২:১৯৬), কোন যিম্মী বা চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা স্বরূপ (৪:৯২), কসমের কাফফারা স্বরূপ (৫:৮৯) এবং যিহারের কাফফারা স্বরূপ (৫৮:৩-৪); আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন মেয়াদে রোযার হুকুম দেওয়া হয়েছে। তাই সহজেই বোধগম্য যে, রোযা বান্দার পাপসমূহকে ধুয়ে-মুছে রোযাদারকে পরিশুদ্ধ করে।

হযরত হুযায়ফা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

فتنة الرجل فى اهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

মানুষের জন্য তার পরিবার, ধন-সম্পদ, তার আত্মা, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশী ফিতনা স্বরূপ। তার কাফফারা হল নামায, রোযা, দান-সদকাহ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ।-

সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫২৫, ১৮৬৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৮৯২-২৬, মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩২৮০, সুনানে তিরমিযী, হা. ২২৫৮

৯. রোযাদারের মুখের গন্ধ মিশকের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك،

সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়।-

সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৩); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭১৭৪; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫২৩; সুনানে ইবনে মাজাহ- ১৬৩৮

১০. রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح، واذا لقى ربه فرح بصومه، وفى رواية : اذا لقى الله فجزاه فرح،

রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে, যখন সে আনন্দিত হবে। এক. যখন সে ইফতার করে তখন ইফতারের কারণে আনন্দ পায়। দুই. যখন সে তার রবের সাথে মিলিত হবে তখন তার রোযার কারণে আনন্দিত হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন সে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, আর তিনি তাকে পুরস্কার দিবেন, তখন সে আনন্দিত হবে।-

সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৪, ১৮৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৩, ১৬৪, ১৬৫); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৪২৯, ৭১৭৪; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৭৬৬

১১. রোযাদার পরকালে সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত থাকবে

হযরত আমর ইবনে মুররা আলজুহানী রা. হতে বর্ণিত,

جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله! أرايت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس واديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال : من الصديقين والشهداء،

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি একথার সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং অবশ্যই আপনি আল্লাহর রাসূল, আর আমি যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, যাকাত প্রদান করি, রমযান মাসের সিয়াম ও কিয়াম (তারাবীহসহ অন্যান্য নফল) আদায় করি তাহলে আমি কাদের দলভুক্ত হব? তিনি বললেন, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত হবে।-

মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ২৫, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২২১২, সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৯

১২. রোযাদারের দুআ কবুল হয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد.

قال البوصيرى : اسناده صحيح.

ইফতারের সময় রোযাদার যখন দুআ করে, তখন তার দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। (অর্থাৎ তার দুআ কবুল হয়)।-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৭৫৩

হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ثلاثة لا ترد دعوتهم الامام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم، تحمل على الغمام، وتفتح لها ابواب السماوات، ويقول الرب عز وجل : وعزتى لانصرنك ولو بعد حين.

وقال الترمذی : هذا حديث حسن.

তিন ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না (অর্থাৎ তাদের দুআ কবুল করা হয়) ন্যায়পরায়ন শাসকের দুআ; রোযাদার ব্যক্তির দুআ ইফতারের সময় পর্যন্ত ও মজলুমের দুআ। তাদের দুআ মেঘমালার উপরে উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং এর জন্য সব আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। তখন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, আমার ইয্যতের কসম! বিলম্বে হলেও অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করব।-

মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৮০৪৩; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৩৫৯৮; সুনানে ইবনে মাজাহ , হাদীস : ১৭৫২; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৮

হযরত আবু হুরায়রা রা. র্বণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الصائم لا ترد دعوته،

وهذا الحديث اسناده حسن قاله الشيخ محمد عوامة

রোযাদারের দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৯৫

১৩. রোযা হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়

صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر،

وقال المنذرى : ورجاله رجال الصحيح، ورواه احمد وابن حبان والبيهقى الثلاثة من حديث الأعرابى ولم يسموه، (اى ابن عباس)

হযরত ইবনে আববাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সবরের মাসের (রমযান মাস) রোযা এবং প্রতি মাসের তিন দিনের (আইয়্যামে বীয) রোযা অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়। -

মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১০৫৭; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩০৭০; সহীহ ইবনে হিববা ন, হাদীস : ৬৫২৩

১৪. আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম

عن أبى أمامة قال : قلت يا رسول الله! مرنى بعمل قال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت : يا رسول الله! مرنى بعمل قال : عليك بالصوم، فانه لا عدل له.

হযরত আবু উমামা রা .বর্ণনা করেন ,আমি বললাম ,ইয়া রাসূলাল্লাহ !আমাকে কোনো আম লের আদেশ করুন। তিনি বললেন ,তুমি রোযা রাখ ,কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। আ মি পুনরায় বললাম ,ইয়া রাসূলাল্লাহ !আমাকে কোনো নেক আমলের কথা বলুন ,তিনি বল লেন ,তুমি রোযা রাখ ,কেননা এর কোনো সমতুল্য কিছু নেই।-

সহীহ ইবনে খুযাইমা ,হাদীস : ১৮৯৩ ;মুসনাদে আহমদ ,হাদীস : ২২১৪০ ;সহীহ ইবনে

হিববান ,হাদীস : ৩৪২৫ ;সুনানে নাসায়ী কুবরা ,হাদীস : ২৫৩৩ عن أبى أمامة الباهلى قال : قلت يا رسول الله مرنى بأمر ينفعنى الله به، قال : عليك بالصوم فانه لا مثل له. هذا حديث اسناده صحيح على شرط مسلم قاله الشيخ شعيب وكذا قاله الشيخ أحمد شاكر.

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোনো আমলের আদেশ করুন, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাকে উপকৃত করবেন। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা তার তুলনা হয় না।-

সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৩১; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪১; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ৩৮৯৩ তাবারানী, হাদীস : ৭৪৬৩

রোযার বিভিন্ন উপকারী দিকসমূহ

১. আত্মসংযম ও নৈতিক উন্নতি

রোযা মানুষকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়। এটি কেবল শারীরিক বিরতি নয়, বরং আত্মসংযমের শিক্ষা ও নৈতিক উন্নতির একটি মাধ্যম।

হাদীস: নবী করিম ﷺ বলেছেন:

* >الصوم جنة*

> অর্থ: “রোযা ঢাল বা রক্ষাকবচের মতো।”

> এটি বোঝায় যে, রোযা একজন মুসলমানকে পাপ ও নৈতিক দুর্বলতা থেকে রক্ষা করে।

উদাহরণ: যখন ক্ষুধার্ত অবস্থায় একজন রোজাদার অন্যকে সহায়তা করে বা ধৈর্য ধরে কাজ সম্পন্ন করে, তখন তার আত্মশৃঙ্খলা ও ধৈর্য বৃদ্ধি পায়।

ফিকহি ব্যাখ্যা: হাদীস ও সাহাবাদের উদাহরণ অনুযায়ী, রোযা এক ধরনের “নৈতিক প্রশিক্ষণ” যা মানুষের চরিত্রে সুসংহত নৈতিক গঠন গড়ে তোলে।

২. আল্লাহর প্রতি ভরসা ও তাকওয়া বৃদ্ধি

রোযা পালন করার মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। কুরআন নির্দেশ দেয়:

* >لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ*

> অর্থ: “যাতে তোমরা পরহেজগার হও।”

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা:রোজাদার শারীরিক কষ্ট সহ্য করার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি ভরসা ও আস্থা বৃদ্ধি করে। এটি তার ইমানকে দৃঢ় করে ও নৈতিক চরিত্রকে সমৃদ্ধ করে।

উদাহরণ: ফজরের সময় ভোরের ইমারতের নামাজের পরে সেহরি খাওয়া এবং দিনে ধৈর্য ধরে রোযা রাখা একজন মুসলমানের তাকওয়া বৃদ্ধি করে।

৩. সামাজিক শিক্ষা ও সহানুভূতি

রোযা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সহানুভূতি ও মানবিকতা বৃদ্ধি করে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের অনুভূতি মানুষকে দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি সহানুভূতিশীল ও দয়াশীল করে। উদাহরণ:রমজান মাসে ইফতার বিতরণ, যকাত প্রদান, ও দরিদ্রদের খাওয়ানো।

৪. স্বাস্থ্যগত উপকারিতা

নিয়মিত রোযা শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী।

শারীরিক প্রভাব:

* বিপাক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে সাহায্য
* লিভার ও কিডনির বিশ্রাম
* হজম প্রক্রিয়া উন্নত করা
*মন ও মানসিক স্বাস্থ্যে প্রভাব:
*রোযা মানসিক দৃঢ়তা ও ধৈর্য বৃদ্ধি করে
* অযথা খাওয়া ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণে সহায়ক

৫. আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও নেক আমল

রোযা কেবল দেহকে শুদ্ধ রাখে না, বরং আত্মিক ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তি প্রদান করে।

হাদীস: নবী করিম ﷺ বলেছেন:

* >من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه*

> অর্থ: “যে ব্যক্তি রমজান মাস রোযা রাখে, তার পূর্বের পাপ মাফ হয়ে যাবে।”

*আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ:

রোজাদারের রাতে ইবাদত, দোয়া, কুরআন পাঠ ও ইফতারের সময় ধ্যান-মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। এটি তার **ইমানকে শক্তিশালী ও নেক আমলকে বৃদ্ধি করে।**

৬. মানসিক ও সামাজিক স্বার্থ*

রোযা ধৈর্য, দায়িত্বশীলতা ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে।

* পরিবারে এবং সমাজে সহমর্মিতা বৃদ্ধি
* সামাজিক ইফতার ও দান-সদকার মাধ্যমে সম্পর্ক দৃঢ় করা
* মানসিক ধৈর্য ও সংযম অর্জন

পঞ্চম অধ্যায়: রোযার মাস’আলা-মাসায়েল (প্রচলিত বিষয়)

রোযা-বিনষ্টকারী বিষয়গুলো দুইভাগে বিভক্ত:

কিছু রোযা-বিনষ্টকারী বিষয় রয়েছে যেগুলো শরীর থেকে কোন কিছু নির্গত হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- সহবাস, ইচ্ছাকৃত বমি করা, হায়েয ও শিঙ্গা লাগানো। শরীর থেকে এগুলো নির্গত হওয়ার কারণে শরীর দুর্বল হয়। এ কারণে আল্লাহ তাআলা এগুলোকে রোযা ভঙ্গকারী বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন; যাতে করে এগুলো নির্গত হওয়ার দুর্বলতা ও রোযা রাখার দুর্বলতা উভয়টি একত্রিত না হয়। এমনটি ঘটলে রোযার মাধ্যমে রোযাদার ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং রোযা বা উপবাসের ক্ষেত্রে আর ভারসাম্য বজায় থাকবে না।

আর কিছু রোযা-বিনষ্টকারী বিষয় আছে যেগুলো শরীরে প্রবেশ করানোর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- পানাহার। তাই রোযাদার যদি পানাহার করে তাহলে যে উদ্দেশ্যে রোযার বিধান জারী করা হয়েছে সেটা বাস্তবায়িত হবে না।[মাজমুউল ফাতাওয়া ২৫/২৪৮]

আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতে রোযা-বিনষ্টকারী বিষয়গুলোর মূলনীতি উল্লেখ করেছেন:

"এখন তোমরা নিজ স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু লিখে রেখেছেন তা (সন্তান) তালাশ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো সুতা থেকে ভোরের শুভ্র সুতা পরিস্কার ফুটে উঠে..."[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা রোযা-নষ্টকারী প্রধান বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে- পানাহার ও সহবাস। আর রোযা নষ্টকারী অন্য বিষয়গুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাদিসে উল্লেখ করেছেন।

তাই রোযা নষ্টকারী বিষয় ৭টি; সেগুলো হচ্ছে-

১। সহবাস

২। হস্তমৈথুন

৩। পানাহার

৪। যা কিছু পানাহারের স্থলাভিষিক্ত

৫। শিঙ্গা লাগানো কিংবা এ জাতীয় অন্য কোন কারণে রক্ত বের করা

৬। ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা

৭। মহিলাদের হায়েয ও নিফাসের রক্ত বের হওয়া

এ বিষয়গুলোর মধ্যে **প্রথম হচ্ছে- সহবাস;** এটি সবচেয়ে বড় রোযা নষ্টকারী বিষয় ও এতে লিপ্ত হলে সবচেয়ে বেশি গুনাহ হয়। যে ব্যক্তি রমযানের দিনের বেলা স্বেচ্ছায়

স্ত্রী সহবাস করবে অর্থাৎ দুই খতনার স্থানদ্বয়ের মিলন ঘটাবে এবং পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ লজ্জাস্থানের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যাবে সে তার রোযা নষ্ট করল; এতে করে বীর্যপাত হোক কিংবা না হোক। তার উপর তওবা করা, সেদিনের রোযা পূর্ণ করা, পরবর্তীতে এ দিনের রোযা কাযা করা ও কঠিন কাফফারা আদায় করা ফরয। এর দলিল হচ্ছে- আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস তিনি বলেন: "এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি ধ্বংস হয়েছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: কিসে তোমাকে ধ্বংস করল? সে বলল: আমি রমযানে (দিনের বেলা) স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। তিনি বললেন: তুমি কি একটি ক্রীতদাস আযাদ করতে পারবে? সে বলল: না। তিনি বললেন: তাহলে লাগাতার দুই মাস রোযা রাখতে পারবে? সে বলল: না। তিনি বললেন: তাহলে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল: না...[হাদিসটি সহিহ বুখারী (১৯৩৬) ও সহিহ মুসলিমে (১১১১) এসেছে]

স্ত্রী সহবাস ছাড়া অন্য কোন কারণে কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হয় না।

দ্বিতীয়: হস্তমৈথুন। হস্তমৈথুন বলতে বুঝায় হাত দিয়ে কিংবা অন্য কিছু দিয়ে বীর্যপাত করানো। হস্তমৈথুন যে রোযা ভঙ্গকারী এর দলিল হচ্ছে- হাদিসে কুদসীতে রোযাদার সম্পর্কে আল্লাহর বাণী: "সে আমার কারণে পানাহার ও যৌনকর্ম পরিহার করে" সুতরাং যে ব্যক্তি রমযানের দিনের বেলা হস্তমৈথুন করবে তার উপর ফরয হচ্ছে– তওবা করা, সে দিনের বাকী সময় উপবাস থাকা এবং পরবর্তীতে সে রোযাটির কাযা পালন করা। আর যদি এমন হয়– হস্তমৈথুন শুরু করেছে বটে; কিন্তু বীর্যপাতের আগে সে বিরত হয়েছে তাহলে আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে; তার রোযা সহিহ। বীর্যপাত না করার কারণে তাকে রোযাটি কাযা করতে হবে না। রোযাদারের উচিত হচ্ছে– যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী সবকিছু থেকে দূরে থাকা এবং সব কুচিন্তা থেকে নিজের মনকে প্রতিহত করা। আর যদি, মজি বের হয় তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী– এটি রোযা ভঙ্গকারী নয়।

তৃতীয়: পানাহার। পানাহার বলতে বুঝাবে– মুখ দিয়ে কোন কিছু পাকস্থলীতে পৌঁছানো। অনুরূপভাবে নাক দিয়ে কোন কিছু যদি পাকস্থলীতে পৌঁছানো হয় সেটাও পানাহারের পর্যায়ভুক্ত। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তুমি ভাল করে নাকে পানি দাও; যদি না তুমি রোযাদার হও।"[সুনানে তিরমিযি (৭৮৮), আলবানি সহিহ তিরমিযিতে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন] সুতরাং নাক দিয়ে

পাকস্থলীতে পানি প্রবেশ করানো যদি রোযাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করত তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল করে নাকে পানি দিতে নিষেধ করতেন না।

চতুর্থ: যা কিছু পানাহারের স্থলাভিষিক্ত। এটি দুইটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। ১. যদি রোযাদারের শরীরে রক্ত পুশ করা হয়। যেমন- আহত হয়ে রক্তক্ষরণের কারণে কারো শরীরে যদি রক্ত পুশ করা হয়; তাহলে সে ব্যক্তির রোযা ভেঙ্গে যাবে। যেহেতু পানাহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে– রক্ত তৈরী। ২. খাদ্যের বিকল্প হিসেবে ইনজেকশন পুশ করা। কারণ এমন ইনজেকশন নিলে পানাহারের প্রয়োজন হয় না।[শাইখ উছাইমীনের 'মাজালিসু শারহি রমাদান', পৃষ্ঠা- ৭০] তবে, যেসব ইনজেকশন পানাহারের স্থলাভিষিক্ত নয়; বরং চিকিৎসার জন্য দেয়া হয়, উদাহরণতঃ ইনসুলিন, পেনেসিলিন কিংবা শরীর চাঙ্গা করার জন্য দেয়া হয় কিংবা টীকা হিসেবে দেয়া হয় এগুলো রোযা ভঙ্গ করবে না; চাই এসব ইনজেকশন মাংশপেশীতে দেয়া হোক কিংবা শিরাতে দেয়া হোক।[শাইখ মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম এর ফতোয়াসমগ্র (৪/১৮৯)] তবে, সাবধানতা স্বরূপ এসব ইনজেকশন রাতে নেয়া যেতে পারে।

কিডনী ডায়ালাইসিস এর ক্ষেত্রে রোগীর শরীর থেকে রক্ত বের করে সে রক্ত পরিশোধন করে কিছু কেমিক্যাল ও খাদ্য উপাদান (যেমন– সুগার ও লবণ ইত্যাদি) যোগ করে সে রক্ত পুনরায় শরীরে পুশ করা হয়; এতে করে রোযা ভেঙ্গে যাবে।[ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/১৯)]

পঞ্চম: শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে রক্ত বের করা। দলিল হচ্ছে– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "যে ব্যক্তি শিঙ্গা লাগায় ও যার শিঙ্গা লাগানো হয় উভয়ের রোযা ভেঙ্গে যাবে।"[সুনানে আবু দাউদ (২৩৬৭), আলবানী সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে (২০৪৭) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

রক্ত দেয়াও শিঙ্গা লাগানোর পর্যায়ভুক্ত। কারণ রক্ত দেয়ার ফলে শরীরের উপর শিঙ্গা লাগানোর মত প্রভাব পড়ে। তাই রোযাদারের জন্য রক্ত দেয়া জায়েয নেই। তবে যদি অনন্যোপায় কোন রোগীকে রক্ত দেয়া লাগে তাহলে রক্ত দেয়া জায়েয হবে। রক্ত দানকারীর রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং সে দিনের রোযা কাযা করবে।[শাইখ উছাইমীনের 'মাজালিসু শারহি রামাদান' পৃষ্ঠা-৭১]

কোন কারণে যে ব্যক্তির রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে– তার রোযা ভাঙ্গবে না; কারণ রক্ত ক্ষরণ তার ইচ্ছাকৃত ছিল না।[স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/২৬৪)]

আর দাঁত তোলা, ক্ষতস্থান ড্রেসিং করা কিংবা রক্ত পরীক্ষা করা ইত্যাদি কারণে রোযা ভাঙ্গবে না; কারণ এগুলো শিঙ্গা লাগানোর পর্যায়ভুক্ত নয়। কারণ এগুলো দেহের উপর শিঙ্গা লাগানোর মত প্রভাব ফেলে না।

ষষ্ঠ: ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা। দলিল হচ্ছে– "যে ব্যক্তিরঅনিচ্ছাকৃতভাবে বমিএসে যায় তাকে উক্ত রোযা কাযা করতে হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বমি করল তাকে সে রোযা কাযা করতে হবে"[সুনানে তিরমিযি (৭২০), আলবানী সহিহ তিরমিযি গ্রন্থে (৫৭৭) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

হাদিসে ذرعه শব্দের অর্থ غلبه।

ইবনে মুনযির বলেন: যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বমি করেছে আলেমদের ঐক্যবদ্ধ অভিমত (ইজমা) হচ্ছে তার রোযা ভেঙ্গে গেছে।[আল-মুগনী (৪/৩৬৮)]

যে ব্যক্তি মুখের ভেতরে হাত দিয়ে কিংবা পেট কচলিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করেছে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কিছু শুকেছে কিংবা বারবার দেখেছে এক পর্যায়ে তার বমি এসে গেছে তাকেও রোযা কাযা করতে হবে।

তবে যদি কারো পেট ফেঁপে থাকে তার জন্য বমি আটকে রাখা বাধ্যতামূলক নয়; কারণ এতে করে তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে।[শাইখ উছাইমীনের মাজালিসু শাহরি রামাদান, পৃষ্ঠা-৭১]

সপ্তম: হায়েয ও নিফাসের রক্ত নির্গত হওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যখন মহিলাদের হায়েয হয় তখন কি তারা নামায ও রোযা ত্যাগ করে না!?"[সহিহ বুখারী (৩০৪)]

তাই কোন নারীর হায়েয কিংবা নিফাসের রক্ত নির্গত হওয়া শুরু হলে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে; এমনকি সেটা সূর্যাস্তের সামান্য কিছু সময় পূর্বে হলেও। আর কোন নারী যদি অনুভব করে যে, তার হায়েয শুরু হতে যাচ্ছে; কিন্তু সূর্যাস্তের আগে পর্যন্ত রক্ত বের হয়নি তাহলে তার রোযা শুদ্ধ হবে এবং সেদিনের রোযা তাকে কাযা করতে হবে না। আর হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত নারীর রক্ত যদি রাত থাকতে বন্ধ হয়ে যায় এবং সাথে সাথে তিনি রোযার নিয়ত করে নেন; তবে গোসল করার আগেই ফজরহয়ে যায় সেক্ষেত্রে আলেমদের মাযহাব হচ্ছে– তার রোযা শুদ্ধ হবে।

হায়েযবতী নারীর জন্য উত্তম হচ্ছে তার স্বাভাবিক মাসিক অব্যাহত রাখা এবং আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন সেটার উপর সন্তুষ্ট থাকা, হায়েয-রোধকারী কোন কিছু ব্যবহার না-করা। বরং আল্লাহ তার থেকে যেভাবে গ্রহণ করেন সেটা মেনে নেয়া

অর্থাৎহায়েয এর সময় রোযা ভাঙ্গা এবং পরবর্তীতে সে রোযা কাযা পালন করা। উম্মুল মুমিনগণ এবং সলফে সালেহীন নারীগণ এভাবেই আমল করতেন।[স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/১৫১)]

তাছাড়া চিকিৎসা গবেষণায় হায়েয বা মাসিক রোধকারী এসব উপাদানের বহুমুখী ক্ষতি সাব্যস্ত হয়েছে। এগুলো ব্যবহারের ফলে অনেক নারীর হায়েয অনিয়মিত হয়ে গেছে। তারপরেও কোন নারী যদি হায়েয বন্ধকারী ঔষধ গ্রহণ করার ফলে তার হায়েযের রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং জায়গাটি শুকিয়ে যায় সে নারী রোযা রাখতে পারবে এবং তার রোযাটি আদায় হয়ে যাবে।

উল্লেখিত বিষয়গুলো হচ্ছে- রোযা বিনষ্টকারী। তবে, হায়েয ও নিফাস ছাড়া অবশিষ্ট বিষয়গুলো রোযা ভঙ্গ করার জন্য তিনটি শর্ত পূর্ণ হতে হয়:

-রোযা বিনষ্টকারী বিষয়টি ব্যক্তির গোচরীভূত থাকা; অর্থাৎ এ ব্যাপারে সে অজ্ঞ না হয়।

-তার স্মরণে থাকা।

-জোর-জবরদস্তির স্বীকার না হয়ে স্বেচ্ছায় তাতে লিপ্ত হওয়া।

এখন আমরা এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করব যেগুলো রোযা নষ্ট করে না:

যেসব কারনে রোজা ভঙ্গ হয় না:

১. কোন রোজাদার ভুলক্রমে কোন কিছু পানাহার করলে

২. ভুলক্রমে যৌন-সম্ভোগ করলে

৩. স্বপ্নদোষ হলে

৪. স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত এর দরুন বীর্যপাত হলে

৫. তেল মালিশ করলে

৬. শিঙ্গা লাগালে এবং সুরমা লাগালে।

৭. স্ত্রীকে চুম্বন করলে

৮. আপনা আপনি বমি হলে

৯. কানে পানি গেলে, ধূলা প্রবেশ করলে, ধোঁয়া গলায় গেলে

১০. কেউ মৃত ব্যাক্তি বা পশুর সাথে যৌন কাজ করলে অথবা যৌনাঙ্গ ব্যতীত অন্যত্র যৌন সম্ভোগ করলে কিংবা স্ত্রীকে চুমু খেলে, কিংবা স্ত্রীকে স্পর্শ করলে যদি তার বীর্যপাত না হয় তবে তার রোযা ভঙ্গ হবে না

যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হলে শুধু কাজা ওয়াজিব হয়:

১. স্ত্রীকে চুম্বন করার কারণে বীর্যপাত হলে।

২. ইচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি করলে।

৩. কোন খাদ্যবস্তু তথা পাথর, লোহার টুকরা, ফলের আঁটি ইত্যাদি গিলে ফেললে।

৪. যৌনাঙ্গ ব্যতীত অন্য স্থানে সঙ্গম করায় বীর্যপাত হলে।

৫. জোরপূর্বক রোজাদারকে কিছু খাওয়ানো হলে।

৬. ভুলক্রমে কিছু খেতে আরম্ভ করে রোজা ভঙ্গ হয়েছে মনে করে পুনরায় আহার করলে।

৭. কুলি করার সময় পেটে পানি চলে গেলে।

৮. রাত মনে করে সুবহে সাদিকের পর পানাহার করলে।।

৯. সূর্য্য ডুবে গেছে মনে করে সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করলে।

১০. মুখে বমি এনে পুনরায় তা প্রবেশ করালে।।।

১১. দাঁতের ফাঁক থেকে খাদ্য কণা বের করে গিলে ফেললে যদি ছোলা বুটের সমান বা তার চেয়ে বড় হয়। (আল-মিসবাহুন
নূরী শরহে মুখতাসারুল কুদ্দুরী, পৃঃ ১/২০৬-২১১)

যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হলে কাজা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হয়

রোজা রাখতে অপারগ ব্যক্তির জন্য শর্ত সাপেক্ষে অব্যহতির সুযোগ রয়েছে। তবে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা ভেঙে ফেলবে।

বা নষ্ট করবে; তাদের জন্য রোজার কাযা ও কাফফারা উভয়টি আদায় করতে হবে। যেসব কাজে রোজার কাযা ও কাফফারা উভয়টি আদায় করতে হবে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো-১. দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস

রোজা রেখে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করলে; চাই তাতে বীর্যপাত হোক আর না হোক। সে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ওপর। কাযা ও কাফফারা আবশ্যক হবে। হাদিসে এসেছে-হযরত আবূ হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা: এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। রাসূল সা: জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কে ধ্বংস করেছে? সাহাবী বললেন, রমজানে আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি।

রাসূল সা: তাকে বললেন, তাহলে এর বদলে একটি গোলাম আজাদ কর। সাহাবী বললেন, আমি এতে সক্ষম নই। নবীজী সা: বললেন, তাহলে লাগাতার দুই মাস রোযা রাখ। সাহাবী বললেন, আমি এতেও সক্ষম নই। তখন রাসূল সা: বললেন, তাহলে তুমি ৬০ জন মিসকিনকে খানা খাওয়াও। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-১৬৭১, মুসনাদে আহমাদ: হাদীস নং-৬৯৪৪, মুসনাদুল বাজ্জার, হাদীস নং-১১০৭, সহীহ ইবনে খুজাইমা, হাদীস নং-১৯৪৯, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৩৫২৭)- মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'বিশ্বনবি ঐ ব্যক্তিকে (যে স্ত্রী-সহবাসে লিপ্ত হয়েছিল) কাফফারা আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে কাযা আদায়েরও আদেশ করেছিলেন।' (মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক)

কোবা আদায়েরও আদেশ করোহুলেনা (মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক)

তবে রোজার মাসে রাতের বেলায় স্ত্রী সহবাসে কোনো বাঁধা নেই। আর তাতে রোজার কোনো ক্ষতিও হবে না।

স্ত্রী রাজি না থাকা অবস্থায় জোরপূর্বক যদি স্বামী সহবাস করে, তাহলে স্ত্রীর রোযা ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু তার উপর শুধু পরবর্তীতে।

কাযা রাখা আবশ্যক হবে কাফফারা দিতে হবে না। কিন্তু স্বামীর উপর কাযা ও কাফফারা উভয়ই আবশ্যক হবে।

২. পানাহার: ইসলামি শরিয়তের ওজর ব্যতিত দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু পানাহার করলে ওই ব্যক্তির ওপর। কাজা ও কাফফারা উভয়টি আদায় করা আবশ্যক।

এক ব্যক্তি রমজানে রোজা রেখে (ইচ্ছাকৃতভাবে) পানাহার করলো। বিশ্বনবি তাকে আদেশ করলেন, 'সে যেন একজন দাস। আযাদ করে দেয় অথবা দুই মাস (একাধারে) রোজা রাখে কিংবা ৬০জন মিসকিনকে (দু'বেলা) খাবার খাওয়ায়।' (দারাকুতনি)।

ইমাম জুহরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'রমজানে রোজা রেখে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করবে; তার হুকুম। ইচ্ছাকৃতভাবে দিনে সহবাসকারীর অনুরূপ।' অর্থাৎ তাকে কাযা ও কাফফারা উভয়টি আদায় করতে হবে।

৩. ধূমপান:বিড়ি-সিগারেট, হুক্কা পান করলেও রোজা ভেঙে যাবে এবং এ কাজে কাযা ও কাফফারা উভয়টি জরুরি হবে।

৪. সাহরির শেষ সময় জেনেও যারা পানাহার করে:
সুবহে সাদিক হয়ে গেছে জানা সত্ত্বেও আজান শোনা যায়নি বা এখনো ভালোভাবে আলো ছড়ায়নি এ ধরনের ভিত্তিহীন। অজুহাতে খাওয়া দাওয়া করে অথবা স্ত্রী সহবাসে মিলিত হয়। এতে ওই ব্যক্তির রোজা বিশুদ্ধ হবে না।আর যদি কেউ রোজার নিয়ত করার পর এমনটি করে থাকে তবে তাদের জন্য কাযা-কাফফারা দুটোই জরুরি হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

'রোজার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোষক এবং তোমরা তাদের পোষাক। আল্লাহ জানতেন, তোমরা আত্ম প্রতারণা করছ। তাই তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন।
অতএব তোমরা তোমাদের পত্নীদের সঙ্গে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা (সন্তান) লিখে রেখেছেন, তা কামনা কর।
আর তোমরা পানাহার কর; যতক্ষণ সকালের কালো রেখা থেকে সাদা রেখা প্রকাশ হয়, তৎপর রোজাকে রাত পর্যন্ত পূর্ণ কর এবং তোমরা মসজিদে ইতেকাফ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করো না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং এ সবের ধারে কাছেও যেও। না। এভাবে আল্লাহ মানব জাতির জন্য নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করে থাকেন; হয়তো তরা পরহেজগারী অবলম্বন করবে। (সুরা বাকারা আয়াত ১৮৭)

কাফফারার বিধান:
রোজার কাফফারা যিহারের কাফফারার মত। যিহারের কাফফারা হলো-

১. একটি দাস আজাদ করা।
২. অথবা ধারাবাহিকভাবে দু মাস রোজা রাখা।
৩. অথবা ৬০ জন মিসকিনকে দু'বেলা আহার করানো।

কাফফারা হল, লাগাতার ষাট দিন রোযা রাখতে হবে। মাঝখানে একদিনও কাযা করা যাবে না। কাযা হলে আবার প্রথম থেকে ষাটটি রাখতে হবে।

যদি কোন ব্যক্তি রোযা রাখতে না পারে বয়সের কারণে বা অসুস্থ্যতার কারণে তাহলে ষাটজন মিসকিনকে দু'বেলা খানা
খাওয়াতে হবে। একদিনের খানা সদকায়ে ফিতির পরিমাণ টাকা।

রোযা রাখতে সক্ষম ব্যক্তি মিসকিনকে খানা খাওয়ালে কাফফারা আদায় হবে না।

وقعت على قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ؟» : هلكت، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ صَمْ شَهْرَيْن متتابعين لا أجد ، قال قَالَ اعْتق رقبة امْرَأَتِي في رمضان، فقال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطعم ستين مسكينًا : لا أطيق، قال

অনুবাদ- হযরত আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাঃ এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে। গেছি। রাসূল সাঃ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কে ধ্বংস করেছে? সাহাবী বললেন, রমজানে আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। রাসূল সাঃ তাকে বললেন, তাহলে এর বদলে একটি গোলাম আযাদ কর। সাহাবী বললেন, আমি এতে সক্ষম
নই। নবীজী সাঃ বললেন, তাহলে লাগাতার দুই মাস রোযা রাখ। সাহাবী বললেন, আমি এতেও সক্ষম নই। তখন রাসূল সাঃ বললেন, তাহলে তুমি ৬০ জন মিসকিনকে খানা খাওয়াও। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-১৬৭১, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৬৯৪৪, মুসনাদুল বাজ্জার, হাদীস নং-১১০৭, সহীহ ইবনে খুজাইমা, হাদীস নং-১৯৪৯, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৩৫২৭)

রোজা অবস্থায় যে সকল কাজ করা মাকরুহ:

এমন কিছু কাজ রয়েছে, যা রোজা অবস্থায় করা মাকরুহ। এসকল কাজ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। নিচে রোজা অবস্থায় মাকরুহ কাজগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

১. অপ্রয়োজনীয় কোনো বস্তু চিবানো বা চাখা

রোজা অবস্থায় অপ্রয়োজনীয় কোনো খাদ্য বা দ্রব্য চিবানো বা চাখা মাকরুহ।

২. কোনো দ্রব্য মুখে দিয়ে রাখা

রোজা অবস্থায় কোনো দ্রব্য যেমন পাতা, কাঠি বা অন্য কিছু মুখে দিয়ে রাখা মাকরুহ।

৩. মুখে পানি গড়গড় করা বা নাকে পানি টেনে নেওয়া

রোজা অবস্থায় প্রয়োজন ছাড়া বারবার গড়গড়া করা বা নাকের পানি ভেতরে টেনে নেওয়া মাকরুহ। যদি অসাবধানতায় পানি গলায় চলে যায়, তাহলে রোজা ভেঙে যাবে।

৪. ইচ্ছাকৃত মুখে থুথু জমা করে গলাধঃকরণ করা

রোজা অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে মুখের লালা গিলে ফেলা মাকরুহ নয়, তবে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখে থুথু জমিয়ে তা গলাধঃকরণ করা মাকরুহ। এটি আদবের পরিপন্থী কাজ।

৫. গীবত, গালি-গালাজ ও ঝগড়া-ফাসাদ করা

আত্মসংযম ও নিজের গোনাহ থেকে বিরত রাখা রোজার অন্যতম শিক্ষা। গীবত (পরনিন্দা), গালি-গালাজ, এবং ঝগড়া-ফাসাদ রোজার সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয়। হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং খারাপ কাজ করা পরিত্যাগ করে না, তার পানাহার থেকে বিরত থাকা আল্লাহর কাছে কোনো মূল্য রাখে না।"

– (সহিহ বুখারি: ১৭৮২)

শিক্ষা: যদি কেউ ঝগড়া করতে আসে, তবে বলতে হবে: "আমি রোজাদার।"

৬. সারা দিন নাপাক অবস্থায় থাকা

রোজার সময় সারা দিন নাপাক অবস্থায় থাকা মাকরুহ। এটি ইবাদত এবং পবিত্রতা রক্ষা করার মূল শিক্ষার পরিপন্থী।

৭. অস্থিরতা বা বিরক্তি প্রকাশ করা

রোজা হলো ধৈর্যশীলতার পরীক্ষা। অস্থিরতা বা বিরক্তি প্রকাশ করা রোজার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

৮. টুথ পাউডার, পেস্ট বা দাঁতের মাজন দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা

রোজার সময় মাজন, টুথপেস্ট বা অন্য কোনো পাউডার ব্যবহার করে দাঁত পরিষ্কার করা মাকরুহ। কারণ এতে সামান্য অংশ গলায় চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিকল্প হিসেবে মিসওয়াক ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে, যেন মিসওয়াকের কোনো ভেঙে অংশ গলার ভেতরে চলে না যায়।

৬ষ্ঠ অধ্যায়-সেহরী ও ইফতারেরর বিধান

সেহরী বা সাহারী খাওয়া

মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে রোযার জন্য সেহরী খাওয়া মুস্তাহাব এবং যে ব্যক্তি তা ইচ্ছাকৃত খায় না সে গোনাহগার নয়। আর এ কারণেই যদি কেউ ফজরের পর জাগে এবং সেহরী খাওয়ার সময় না পায়, তাহলে তার জন্য জরুরী রোযা রেখে নেওয়া। এতে তার রোযার কোন ক্ষতি হবে না। বরং ক্ষতি হবে তখন, যখন সে কিছু খেতে হয় মনে করে তখনই (ফজরের পর) কিছু খেয়ে ফেলবে। সে ক্ষেত্রে তাকে সারা দিন পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে এবং রমাযান পরে সেই দিন কাযা করতে হবে।

সেহরী খাওয়া যে উত্তম তা প্রকাশ করার জন্য মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) উম্মতকে বিভিন্ন কথার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি সেহরীকে বরকতময় খাদ্য বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, "তোমরা সেহরী খাও। কারণ, সেহরীতে বরকত আছে।" (বুখারী ১৮২৩, মুসলিম ১০৯৫নং)

"তোমরা সেহরী খেতে অভ্যাসী হও। কারণ, সেহরীই হল বরকতময় খাদ্য।" (আহমাদ, মুসনাদ, নাসাঈ সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ৪০৮১নং)

ইরবায বিন সারিয়াহ বলেন, একদা রমাযানে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাকে সেহরী খেতে ডাকলেন; বললেন, "বরকতময় খানার দিকে এস।" (আহমাদ, মুসনাদ, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে হিববান, সহীহ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ, সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ৭০৪৩নং)

সেহরীতে বরকত থাকার মানে হল, সেহরী রোযাদারকে সবল রাখে এবং রোযার কষ্ট তার জন্য হাল্কা করে। আর এটা হল শারীরিক বরকত। পক্ষান্তরে শরয়ী বরকত হল, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশ পালন এবং তাঁর অনুসরণ।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এই সেহরীর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তা দিয়ে মুসলিম ও আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের) রোযার মাঝে পার্থক্য চিহ্নিত করেছেন। তিনি অন্যান্য ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করার মত তাতেও বিরোধিতা করতে আমাদেরকে আদেশ করেছেন। তিনি বলেন, "আমাদের রোযা ও আহলে কিতাবের রোযার মাঝে পার্থক্য হল সেহরী খাওয়া।" (মুসলিম ১০৯৬, আবূ দাঊদ ২৩৪৩, ফাসিঃ মুসনিদ ৯৮পৃঃ)

কি খেলে সেহরী খাওয়া হবে?

অল্প-বিস্তর যে কোন খাবার খেলেই সেহরী খাওয়ার বিধি পালিত হয়ে যাবে। এমনকি কেউ যদি এক ঢোক দুধ, চা অথবা পানিও খায় অথবা ২/১টি বিস্কুট বা খেজুরও খায়, তাহলে তারও সেহরী খাওয়ার সুন্নত পালন হয়ে যাবে। আর এই সামান্য পরিমাণ খাবারেই রোযাদার এই বিরাট ফরয রোযা পালনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে বল পাবে এবং ফিরিশ্তাবর্গ তার জন্য দুআ করবে।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ''সেহরী খাওয়াতে বর্কত আসে। সুতরাং তোমরা তা খেতে ছেড়ো না; যদিও তাতে তোমরা এক ঢোক পানিও খাও। কেননা, যারা সেহরী খায় তাদের জন্য আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশ্তা দুআ করতে থাকেন।'' (আহমাদ, মুসনাদ, সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ৩৬৮৩নং)

তিনি আরো বলেন, ''তোমরা সেহরী খাও; যদিও এক ঢোক পানি হয়।'' (আহমাদ, মুসনাদ, ইবনে হিববান, সহীহ প্রমুখ, সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ২৯৪৫নং)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ''মুমিনের শ্রেষ্ঠ সেহরী হল খেজুর।'' (আবূ দাঊদ ২৩৪৫ নং, ইবনে হিববান, সহীহ, বাইহাকী ৪/২৩৬-২৩৭, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ৫৬২নং)

অবশ্য সেহরী খাওয়াতে বাড়াবাড়ি করা উচিৎ নয়। কারণ, বেশী পানাহার করার ফলে ইবাদত ও আনুগত্যে আলস্য সৃষ্টি হয়।

কিছু লোক আছে, যারা গলায় গলায় ভ্যারাইটিজ পানাহার করে এমনভাবে পেট পূর্ণ করে নেয় যে, মনে হয় তার শবাসকষ্ট হচ্ছে। যার ফলে ফজরের নামাযে বড় আলস্য ও শৈথিল্যের সাথে উপস্থিত হয় এবং মসজিদে আল্লাহর যিক্রের জন্যও সামান্য ক্ষণ বসতে সক্ষম হয় না। আর দিনের বেলায় পেটের বিভিন্ন প্রকার কমপে½নের শিকার হয়। অথচ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ''উদর অপেক্ষা নিকৃষ্টতর কোন পাত্র মানুষ পূর্ণ করে না। আদম সন্তানের জন্য ততটুকুই খাদ্য যথেষ্ট, যতটুকুতে তার পিঠ সোজা করে রাখে। আর যদি এর চেয়ে বেশী খেতেই হয় তাহলে যেন সে তার পেটের এক তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানের জন্য এবং অন্য আর এক তৃতীয়াংশ শবাস-প্রশবাসের জন্য ব্যবহার করে।'' (আহমাদ, মুসনাদ, তিরমিযী ২৩৮০, ইবনে মাজাহ ৩৩৪৯, ইবনে হিববান, সহীহ, হাকেম, মুস্তাদ্রাক ৪/১২১, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ২২৬৫, সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ৫৬৭৪নং)

সেহরীর সময়

সেহরী খাওয়ার সময় হল অর্ধরাত্রির পর থেকে ফজরের আগে পর্যন্ত। আর মুস্তাহাব হল, ফজর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না হলে শেষ সময়ে সেহরী খাওয়া। আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, যায়দ বিন ষাবেত তাঁকে জানিয়েছেন যে, তাঁরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সেহরী খেয়ে (ফজরের) নামায পড়তে উঠে গেছেন। আনাস বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'সেহরী খাওয়া ও আযান হওয়ার মধ্যে কতটুকু সময় ছিল?' উত্তরে যায়দ বললেন, 'পঞ্চাশ অথবা ষাটটি আয়াত পড়তে যতটুকু লাগে।' (বুখারী ৫৭৫, ১৯২১, মুসলিম ১০৯৭, তিরমিযী ৭০৩নং)

এখানে আয়াত বলতে মধ্যম ধরনের আয়াত গণ্য হবে। আর এই শ্রেণীর ৫০/৬০টি আয়াত পড়তে মোটামুটি ১৫/২০ মিনিট সময় লাগে। অতএব সুন্নত হল, আযানের ১৫/২০ মিনিট আগে সেহরী খাওয়া।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবাগণ খুব তাড়াতাড়ি (সময় হওয়া মাত্র) ইফতার করতেন এবং খুব দেরী করে সেহরী খেতেন।(বাইহাকী ৪/২৩৮, ইবনে আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ ৮৯৩২নং)

সুতরাং সেহরী আগে আগে খেয়ে ফেলা উচিৎ নয়। মধ্য রাতে সেহরী খেয়ে ঘুমিয়ে পড়া তো মোটেই উচিৎ নয়। কারণ, তাতে ফজরের নামায ছুটে যায়। ঘুমিয়ে থেকে হয় তার জামাআত ছুটে যায়। নচেৎ, নামাযের সময় চলে গিয়ে সূর্য উঠার পর চেতন হলে নামাযটাই কাযা হয়ে যায়। নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক। আর নিঃসন্দেহে এটি একটি বড় মসীবত; যাতে বহু রোযাদার ফেঁসে থাকে। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত করুন। আমীন।

ফজর উদয় হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হলে

ফজর উদয় হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হলে রোযাদার ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার করতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ফজর উদয় হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে। আর সন্দেহের উপর পানাহার বন্ধ করবে না। যেহেতু মহান আল্লাহ পানাহার বন্ধ করার শেষ সময় নির্ধারিত করেছেন নিশ্চিত ও স্পষ্ট ফজরকে; সন্দিগ্ধ ও অস্পষ্ট ফজরকে নয়। তিনি বলেছেন,

(وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)

অর্থাৎ, আর তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না (রাতের) কালো অন্ধকার থেকে ফজরের সাদা রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৭)

এক ব্যক্তি ইবনে আববাস (রাঃ)-কে বলল, 'আমি সেহরী খেতে থাকি। অতঃপর যখন (ফজর হওয়ার) সন্দেহ হয়, তখন (পানাহার) বন্ধ করি।' তিনি বললেন, 'যতক্ষণ সন্দেহ থাকে ততক্ষণ খেতে থাক, সন্দেহ দূর হয়ে গেলে খাওয়া বন্ধ কর।' (ইবনে আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ ৯০৫৭, ৯০৬৭নং)

ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন, 'ফজর উদয় হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হলেও যতক্ষণ পর্যন্ত না নিশ্চিত হওয়া গেছে ততক্ষণ রোযাদার পানাহার করতে পারবে।' (ফিকহুস সুন্নাহ ১/৪০৪)

যদি কোন ব্যক্তি ফজর উদয় হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রেখে খায়, অথবা ফজর উদয় হয়নি মনে করে খায়, অতঃপর জানতে পারে যে, খাওয়ার আগেই ফজর উদয় হয়ে গেছে, অথবা ফজরের আযান হয়ে গেছে, তাহলে তার রোযা শুদ্ধ এবং তাকে ঐ রোযা কাযা করতে হবে না। যদিও সে আসলে ফজরের পর খেয়েছে। কারণ, সে না জেনে খেয়েছে। আর না জেনে খাওয়া ক্ষমার্হ। অর্থাৎ তা ধর্তব্য নয়।(আশশারহুল মুমতে' ৬/৪০৯-৪১১)

পক্ষান্তরে যদি কেউ ঘুম থেকে জেগে উঠে জানতে পারে যে, ফজর বা ফজরের আযান হয়ে গেছে এবং তা সত্ত্বে পানি বা অন্য কিছু খায়, তাহলে তার রোযা হবে না। তাকে ঐ দিন পানাহার ইত্যাদি রোযার মতই বন্ধ রেখে রমাযান পর কাযা রাখতে হবে।

জ্ঞাতব্য যে, সেহরীর শেষ সময় হল পূর্ব আকাশে ছড়িয়ে পড়া সাদা আলোক রেখার উদ্ভব কাল। সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ''বিলালের আযান এবং (পূর্বাকাশে) আলম্বিত শুভ্র জ্যোতি যেন তোমাদেরকে সেহরী খাওয়াতে বাধা না দেয়। অবশ্য পূর্বাকাশে ছড়িয়ে পড়া জ্যোতি দেখে খাওয়া বন্ধ করো।'' (আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাঊদ ২৩৪৬, তিরমিযী, ইবনে আবী শাইবাহঃ, দারাকুত্বনী, বাইহাকী, ইরওয়াউল গালীল ৯১৫নং)

বলা বাহুল্য, ছড়িয়ে পড়া উক্ত সাদা রেখা পরিদৃষ্ট হলে সাথে সাথে রোযাদারের জন্য পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত হওয়া ওয়াজেব। তাতে সে ফজরের আযান শুনুক, অথবা না শুনুক। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন, ''তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না (রাতের) কালো অন্ধকার থেকে ফজরের সাদা রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে।'' (কুরআনুল কারীম ২/১৮৭)

আর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘‘ইবনে উম্মে মাকতূমের আযান না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। কারণ, সে ফজর উদয় না হলে আযান দেয় না।’’ (বুখারী ১৯১৮, মুসলিম ১০৯২নং)

লক্ষণীয় যে, ফজর উদয় হয়েছে কি না, তা-ই দেখার বিষয়; আযান হয়েছে কি না, তা নয়। অতএব মুআযযিন যদি নির্ভরযোগ্য হয় এবং জানা যায় যে, সে ফজর উদয় না হলে আযান দেয় না অথবা ফজর উদয় হওয়ার পরে দেরী করে আযান দেয় না, তাহলে তার আযান শোনামাত্র পানাহার থেকে বিরত হওয়া ওয়াজেব। পক্ষান্তরে মুআযযিন যদি (ফজর উদয়ের) সময় হওয়ার পূর্বেই আযান দেয়, তাহলে তার আযান শুনে পানাহার বন্ধ করা ওয়াজেব নয়। তদনরূপ মুআযযিন যদি ঢিলে হয় এবং যথাসময় থেকে দেরী করে আযান দেয়, তাহলে সময় শেষ জানা সত্ত্বেও আযান হয়নি বলে খেয়ে যাওয়া বৈধ নয়। কারণ, এতে রোযা হবে না।

কিন্তু মুআযযেনের অবস্থা না জানা গেলে, অথবা একই শহরে একাধিক মসজিদের একাধিক মুআযযেনের বিভিন্ন সময়ে আযান হলে এবং শহরের ভিতরে ঘর-বাড়ি তথা লাইটের ফলে ফজর উদয় হওয়ার সময় নিজে নির্ধারণ না করতে পারলে নির্ভরযোগ্য সেই ইসলামী পঞ্জিকা অনুযায়ী আমল করা জরুরী, যাতে নিখুঁতভাবে ফজর উদয়ের স্থানীয় সময় ঘ¦টা-মিনিট সহ স্পষ্ট লিখা থাকে। অতঃপর নিজের ঘড়ি ঠিক রেখে সেই সময় অনুযায়ী সেহরী-ইফতার করলে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সেই হাদীসের উপর আমল হবে, যাতে তিনি বলেন, ‘‘যে বিষয়ে সন্দেহ আছে সে বিষয় বর্জন করে তাই কর যাতে সন্দেহ নেই।’’ (আহমাদ, মুসনাদ, তিরমিযী ২৫১৮, নাসাঈ, ইবনে হিববান, সহীহ, ত্বাবারানী, মু’জাম প্রমুখ, ইরওয়াউল গালীল, আলবানী ২০৭৪, সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ৩৩৭৭, ৩৩৭৮নং)

‘‘সুতরাং যে সন্দিহান বিষয়াবলী থেকে দূরে থাকবে, সে তার দ্বীন ও ইজ্জতকে বাঁচিয়ে নেবে।’’ (আহমাদ, মুসনাদ ৪/২৬৯, ২৭০, বুখারী ৫২, মুসলিম ১৫৯৯নং, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দাঃ)

জ্ঞাতব্য যে, ফজর উদয় হওয়ার ৫/১০ মিনিট আগে সতর্কতামূলকভাবে পানাহার থেকে বিরত হওয়া একটি বিদআত। কোন কোন পঞ্জিকা (বা রমাযান-সওগাতে) যে একটি ঘর সেহরীর শেষ সময়ের এবং পৃথক আর একটি ঘর ফজরের আযানের লক্ষ্য করা যায়, তা আসলে শরীয়ত-বিরোধী কাজ।(দ্রঃ তামামুল মিন্নাহ, আল্লামা আলবানী ৪১৮পৃঃ, সামানিয়া ওয়া আরবাঊন সুআলান ফিস্‌-সিয়াম ৪৮পৃঃ)

কারণ, সেহরীর শেষ সময় যেটাই, সেটাই ফজরের আযানের সময়। আর ফজরের আযানের সময়ের আগে লোকেদের পানাহার বন্ধ করা অবশ্যই শরীয়ত-বিরোধী কাজ। বলা বাহুল্য, (বিশেষ করে) রমাযান মাসে মুআযযিন-ইমামদের উচিৎ, যথাসময়ে আযান দেওয়ার ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা রাখা। রাইট-টাইমের ঘড়ি দ্বারা ফজর উদয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আযান দেওয়া মোটেই উচিৎ নয়। যাতে তাঁরা লোকেদেরকে ধোকা দিয়ে এমন সময় আযান না দিয়ে বসেন, যে সময়ে তাদের জন্য আল্লাহর হালালকৃত খাদ্য তাদের জন্য হারাম করে দেন এবং সময় হওয়ার পূর্বেই ফজরের নামায হালাল করে বসেন। আর এ যে কত বড় বিপজ্জনক, তা অনুমেয়।(ইবনে উষাইমীন ফাসিঃ মুসনিদ ৩৬পৃঃ)

আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘‘যখন তোমাদের কেউ আযান শোনে এবং সেই সময় তার হাতে (পানির) পাত্র থাকে, তখন সে যেন তা থেকে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ না করা পর্যন্ত রেখে না দেয়।’’ (আহমাদ, মুসনাদ ২/৪৩২, ৫১০, আবূ দাঊদ ২৩৫০, দারাকুত্বনী, সুনান ২১৬২, হাকেম, মুস্তাদ্রাক ১/২০৩, বাইহাকী, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ১৩৯৪নং)

অনেক উলামা উক্ত হাদীসটিকে এ কথার দলীল মনে করেন যে, যে ব্যক্তির হাতে খাবারের পাত্র (নিয়ে খেতে) থাকা অবস্থায় ফজর (বা তার আযান) হয়ে যায়, তার জন্য তা থেকে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ না করা পর্যন্ত রেখে দেওয়া (খাওয়া বন্ধ করা) বৈধ নয়। সুতরাং এ ব্যাপারটি আয়াতের সাধারণ নির্দেশ থেকে স্বতন্ত্র। মহান আল্লাহ বলেন,

(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)

‘‘আর তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না (রাতের) কালো অন্ধকার থেকে ফজরের সাদা রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে।’’ (কুরআনুল কারীম ২/১৮৭)

অতএব উক্ত আয়াত তথা অনুরূপ অর্থের সকল হাদীস উপর্যুক্ত হাদীসের বিরোধী নয়। তাছাড়া ইজমার প্রতিকূলও নয়। বরং সাহাবাদের একটি জামাআত এবং আরো অন্যান্যগণ উক্ত হাদীস অপেক্ষা আরো প্রশস্ততা রেখে মনে করেন যে, ফজর উজ্জ্বল হয়ে গেলে এবং ভোরের শুভ্র আলো রাস্তায় ছড়িয়ে পড়লেও সে পর্যন্ত পানাহার করা বৈধ।(দ্রঃ ফাতহুল বারী ৪/১৬২-১৬৩, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ৩/৩৮২-৩৮৪, তামামুল মিন্নাহ, আল্লামা আলবানী ৪১৭-৪১৮পৃঃ)

অনেকে মনে করেন, উক্ত হাদীসে ‘আযান’ বলতে বিলালের আযানকে বুঝানো হয়েছে; যা প্রথম (সেহরী বা তাহাজ্জুদের) আযান এবং যা ফজরের আগে দেওয়া হত। মহানবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘‘বিলাল রাতে আযান দেয়। সুতরাং তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার করতে থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইবনে উম্মে মাকতূম আযান দেয়।’’ (বুখারী ৬১৭নং, মুসলিম)

অথবা উক্ত হাদীসের অর্থ এই যে, আযান শুনেও যদি ফজর উদয়ে সন্দেহ হয়, যেমন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার ফলে অন্ধকার থাকে, তাহলে সে সময় কেবল আযানে ফজর হওয়ার কথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। কারণ, ফজর জানার যে মাধ্যম তা (ফজরের জ্যোতি) নেই। আর মুআযযিন তা দেখে ফজর উদয়ের কথা জানতে পারলে সেও জানতে পারত। পক্ষান্তরে ফজর উদয় হওয়ার কথা এমনিই বুঝতে পারা গেলে মুআযযেনের আযান শোনার প্রয়োজন নেই। কারণ, সে তো (রাতের) কালো অন্ধকার থেকে ফজরের সাদা রেখা স্পষ্ট হলেই পানাহার থেকে বিরত থাকতে আদিষ্ট। এ কথা বলেছেন খাত্ত্বাবী।

বাইহাক্বী বলেন, ‘উক্ত হাদীস সহীহ হলে অধিকাংশ উলামার নিকট তার ব্যাখ্যা এই যে, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) জেনেছিলেন, মুআযযিন ফজর হওয়ার আগে আযান দেয়। সুতরাং তখন সে পান করলে ফজর উদয়ের আগেই পান করা হবে।’ (বাইহাকী ৪/২১৮)

আলী আল-ক্বারী বলেন, ‘উক্ত নির্দেশ তখন প্রযোজ্য, যখন ফজর উদয়ে সন্দেহ হয়।’ ইবনুল মালেক বলেন, ‘উক্ত নির্দেশ তখন প্রযোজ্য, যখন জানতে পারবে না যে, ফজর উদয় হয়ে গেছে। নচেৎ, যখন ফজর উদয় হওয়ার কথা জানতে পারবে এবং তাতে সন্দেহ করবে তখন নয়।’ (আউনুল মাবুদ ৬/৩৪১-৩৪২)

এ ছাড়া আরো অন্য ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহই ভালো জানেন।

বলা বাহুল্য, শেষোক্ত উলামাদের মতানুসারে যখন কোন রোযাদার মুখে কোন খাদ্য বা পানীয় থাকা অবস্থায় ফজরের আযান শুনবে, তখনই সে তা মুখ থেকে উগলে ফেলে দেবে। আর এতে তার রোযা শুদ্ধ হয়ে যাবে।(সাবঊনা মাসআলাহ ফিস্‌-সিয়াম ৬১নং)

প্রকাশ থাকে যে, সেহরী খাওয়ার পর মুআযযিনের আযানের অপেক্ষা করে তার ‘আল্লা--’ বলার সাথে সাথে তৈরী রাখা পানি শেষ বারের মত পান করা বৈধ নয়। কারণ, আযান হয় ফজর উদয় হওয়ার সাথে সাথে এবং এ কথা জানাবার উদ্দেশ্যে যে সেহরীর সময় শেষ। অতএব খাবার সময় নেই জানার পরেও খাওয়া শরীয়তের বিরোধিতা তথা রোযা নষ্ট করার কাজ।(তাওজীহাতুন অফাওয়াএদ লিসসা-য়েমীনা অসসায়েমাত ৪০পৃঃ দ্রঃ)

পূর্বের আলোচনায় আমরা জানতে পেরেছি যে, ফজরের আগে একটি আযান আছে, যা তাহাজ্জুদ ও সেহরীর সময় জানাবার জন্য ব্যবহার করা হত মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে। অতএব সেহরীর সময় লোকেদেরকে জাগানোর জন্য সেই আযানের বদলে কুরআন বা গজল পড়া, বেল বা ঘ¦টা বাজানো, অথবা তোপ দাগা বিদআত।(মু'জামুল বিদা' ২৬৮পৃঃ)

ইফতার

রোযার নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে রোযা খোলা বা ইফতার করার জন্য প্রত্যেক রোযাদারের অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করাটাই স্বাভাবিক। আর সেই সময় যে তার রোযা পূর্ণ করতে পারে প্রকৃতিগতভাবে সে খুশী হয়। অতএব ইফতার করতে তাড়াতাড়ি করাটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তা সত্ত্বেও দয়ার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে সত্বর ইফতার করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে, তাতে আমাদের মঙ্গল আছে। তিনি বলেন, ''লোকেরা ততক্ষণ মঙ্গলে থাকবে, যতক্ষণ তারা (সূর্য ডোবার পর নামাযের আগে) ইফতার করতে তাড়াতাড়ি করবে।'' (বুখারী ১৯৫৭, মুসলিম ১০৯৮নং)

যেহেতু ইয়াহুদ ও খ্রিষ্টানরা রোযা রেখে দেরী করে ইফতার করে, তাই তিনি আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ''দ্বীন ততকাল বিজয়ী থাকবে, যতকাল লোকেরা ইফতার করতে তাড়াতাড়ি করবে। কারণ, ইয়াহুদ ও খ্রিষ্টানরা দেরী করে ইফতার করে।'' (আবূ দাঊদ, হাকেম, মুস্তাদ্রাক, ইবনে হিববান, সহীহ, সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ৭৬৮৯নং)

খোদ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর আমল ছিল জলদি ইফতার করা। আবূ আত্বিয়াহ বলেন, আমি ও মাসরূক আয়েশা (রাঃ)এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, 'হে উম্মুল মুমেনীন! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীদের মধ্যে একজন (সময় হওয়া মাত্র) তাড়াতাড়ি ইফতার করে ও তাড়াতাড়ি নামায পড়ে এবং অপর একজন দেরী করে ইফতার করে ও দেরী করে নামায পড়ে।' তিনি বললেন, 'ওদের মধ্যে কে তাড়াতাড়ি ইফতার করে ও তাড়াতাড়ি নামায পড়ে?' আমরা বললাম, 'আব্দুল্লাহ (অর্থাৎ ইবনে মাসঊদ)।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লাম) এ রকমই (তাড়াতাড়ি ইফতার ও নামায আদায়) করতেন।’ (মুসলিম ১০৯৯নং)

সময় হওয়ার সাথে সাথে শীঘ্র ইফতার করা নবুঅতের একটি আদর্শ। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘‘তিনটি কাজ নবুয়তের আদর্শের অন্তর্ভুক্ত; জলদি ইফতার করা, দেরী করে (শেষ সময়ে) সেহরী খাওয়া এবং নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা।’ (ত্বাবারানী, মু’জাম, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১০৫, সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ৩০৩৮নং)’

বলা বাহুল্য, স্থানীয়ভাবে সূর্যের বৃত্তির সমস্ত অংশটা অদৃশ্য হয়ে (অস্ত) গেলে রোযাদারের উচিৎ, সাথে সাথে সেই সময় ইফতার করা। আর এ সময় নিম্ন আকাশে অবশিষ্ট লাল আভা থাকলেও তা দেখার নয়। যেহেতু মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘‘রাত যখন এদিক (পূর্ব গগণ) থেকে আগত হবে, দিন যখন এদিক (পশ্চিম গগণ) থেকে বিদায় নেবে এবং সূর্য যখন অস্ত যাবে, তখন রোযাদার ইফতার করবে।’’ (বুখারী ১৯৪১, ১৯৫৪, মুসলিম ১১০০, ১১০১, আবূ দাঊদ ২৩৫১, ২৩৫২, তিরমিযী, দাঃ)

অতএব দেখার বিষয় হল সূর্যাস্ত; আযান নয়। সুতরাং রোযাদার যদি সবচক্ষে দেখে যে, সূর্য ডুবে গেছে কিন্তু মুআযযিন এখনো আযান দেয়নি, তাহলেও তার জন্য ইফতার করা বৈধ।(আশশারহুল মুমতে’ ৬/৪৩৯)

পক্ষান্তরে পূর্বসতর্কতামূলকভাবে মুআযযিনদের দেরী করে আযান দেওয়া বিদআত।(মু’জামুল বিদা’ ২৬৮পৃঃ)

সূর্য ডোবার পর আবার সূর্য দেখলে

সূর্য ডোবার পর কোন মুসাফির বিমান বন্দরে ইফতার করার পর প্লেনে চড়ে আকাশে উঠে যদি সূর্য দেখে, তাহলে তার জন্য পানাহার থেকে বিরত থাকা এবং পুনরায় রোযায় থাকার নিয়ত করা জরুরী নয়। কারণ, সে তার রোযার পূর্ণ একটি দিন অতিবাহিত করে ফেলেছে। অতএব ইবাদত করার উদ্দেশ্যে তা শেষ হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় শুরু করার কোন পথ নেই। আর তাকে ঐ দিন কাযাও করতে হবে না। কেননা, তার রোযা শুদ্ধ হয়ে গেছে।

পক্ষান্তরে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে প্লেনে উড়ে পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করলে এবং মুসাফির ঐ দিনের রোযা পূর্ণ করতে চাইলে সে নিজের দেশের সময় অনুযায়ী ইফতার

করতে পারবে না। বরং শূন্যে থাকা অবস্থায় যতক্ষণ না সূর্য অস্তমিত হতে দেখবে, ততক্ষণ সে রোযায় থাকতে বাধ্য; যদিও তাতে দিন অনেক লম্বা হবে।

অনুরূপ ইফতার করার জন্য আকাশের যে লেভেলে এসে সূর্য দেখা যায় না সে লেভেলে প্লেনে নামিয়ে আনা পাইলটের জন্য বৈধ নয়। কারণ, তা এক প্রকার ছল-বাহানা। অবশ্য যদি উড্ডয়নের কোন স্বার্থে বিমান নিচের লেভেলে নামাতে হয় এবং সেখানে এসে সূর্য অদৃশ্য হয়, তাহলে ইফতার করা যাবে।(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৪/১২৫, ১৬/১৩০, ৩০/১২৩, সাবঊনা মাসআলাহ ফিস্-সিয়াম ১৯নং)

সূর্য ডুবে গেছে মনে করে ইফতার করলে

সূর্য ডুবে গেছে মনে করে রোযাদার ইফতার করে নেওয়ার পর যদি জানা যায় যে, সূর্য এখনও ডুবে নি, তাহলে সঠিক মতে তার রোযা শুদ্ধ; তাকে কাযা করতে হবে না। কারণ, সে না জেনেই ইফতার করে ফেলেছে। আর অবস্থা (সময়) না জেনে রোযা নষ্টকারী জিনিস ব্যবহার করলে তার এ (না জানার) ওযর গ্রহণযোগ্য। তা ছাড়া আসমা বিন্তে আবী বাক্র (রাঃ) বলেন, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে একদা আমরা মেঘলা দিনে ইফতার করলাম। তারপর সূর্য দেখা গেল।' (বুখারী ১৯৫৯, আবূ দাঊদ ২৩৫৯, ইবনে মাজাহ ১৬৭৪নং) সুতরাং তাঁরা সূর্য ডুবে গেছে মনে করেই দিনের বেলায় ইফতার করেছিলেন। অতএব অবস্থা বা সময় তাঁদের অজানা ছিল; শরয়ী নির্দেশ নয়। তাঁদের ধারণায় ছিল না যে, সে সময়টা দিনের বেলা। আর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁদেরকে সে দিনকে কাযা করতেও আদেশ দেননি। পক্ষান্তরে (উক্ত অবস্থায়) কাযা ওয়াজেব হলে তা শরীয়তরূপে পরিগণিত এবং তার বর্ণনা আজ পর্যন্ত সুরক্ষিত হত। অতএব তা যখন সুরক্ষিত নেই এবং সে ব্যাপারে কোন নির্দেশ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক বর্ণিত নেই, তখন মৌলিক অবস্থা হল, দায়িত্বমুক্ত হওয়া এবং কাযা না করা।(আশশারহুল মুমতে' ৬/৪০২-৪০৩, ৪১০-৪১১)

কি দিয়ে ইফতারী হবে?

কিছু আধা-পাকা অথবা পূর্ণ পাকা (শুকনা) খেজুর দিয়ে এবং তা না পাওয়া গেলে পানি দিয়ে ইফতার করা সুন্নত।

আনাস (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নামাযের পূর্বে কিছু আধা-পাকা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তা না পেলে পূর্ণ পাকা (শুকনা) খেজুর দিয়ে এবং তাও না পেলে কয়েক ঢোক পানি খেয়ে নিতেন।' (আহমাদ, মুসনাদ ৩/১৬৪, আবূ দাঊদ ২৩৫৬, তিরমিযী ৬৯৬, ইবনে মাজাহ ২০৬৫, দারাকুত্বনী, সুনান ২৪০, হাকেম, মুস্তাদ্রাক ১/৪৩২, বাইহাকী ৪/২৩৯, ইরওয়াউল গালীল, আলবানী ৯২২নং)

তিনি আরো বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি খেজুর পায়, সে যেন তা দিয়ে ইফতার করে। যে ব্যক্তি তা না পায়, সে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। কারণ, তা হল পবিত্র।" (সহীহুল জামেউস সাগীর ৬৫৮৩)

ইবনুল কাইয়েম (রঃ) বলেন, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) খেজুর দ্বারা ইফতার করতে এবং তা না পাওয়া গেলে পানি দ্বারা ইফতার করতে উৎসাহিত করতেন। আর এ হল উম্মতের প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ দয়া ও হিতাকাঙ্খার নিদর্শন। পেট খালি থাকা অবস্থায় প্রকৃতি (পাকস্থলী)কে মিষ্টি জিনিস দিলে তা অধিকরূপে গ্রহণ করে এবং তদ্দবারা বিভিন্ন শক্তিও উপকৃত হয়; বিশেষ করে দৃষ্টিশক্তি এর দ্বারা বৃদ্ধি পায়। মদ্বীনার মিষ্টি হল খেজুর। খেজুর মদ্বীনাবাসীর মিষ্টান্ন। খেজুরের উপরই তাদের লালন-পালন। খেজুর তাদের প্রধান খাদ্য এবং তা-ই তাদের সহযোগী খাদ্য। আর অর্ধপক্ক খেজুর তাদের ফলস্বরূপ।

পক্ষান্তরে পানিও (এ সময়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস।) রোযার ফলে কলিজায় এক প্রকার শুষ্কতা আসে। সুতরাং তা প্রথমে পানি দিয়ে আর্দ্র করলে তারপর খাদ্য দ্বারা উপকার পরিপূর্ণ হয়। এ জন্য পিপাসার্ত ও ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য উত্তম হল, প্রথমে একটু পানি পান করে তারপরে খেতে শুরু করা। এ ছাড়া খেজুর ও পানিতে এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, হার্টের উপকারিতায় যার প্রভাবের কথা কেবল ডাক্তারগণই জানেন।' (যাদুল মা'আদ ২/৫০-৫১)

বলা বাহুল্য, কারো কাছে পানি ও মধু থাকলে, পানিকে প্রাধান্য দিয়ে পানি দ্বারা ইফতার করবে। কেননা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, "--- যে ব্যক্তি তা না পায়, সে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। কারণ, তা হল পবিত্র।" অবশ্য পানি পান করার পর মধু খাওয়া দোষাবহ নয়।(আশশারহুল মুমতে' ৬/৪৪২)

এই ভিত্তিতেই খালি পেটে উপকারী বলে দাবী করে প্রথমে আদা-লবণ অথবা (খেজুর ছাড়া) অন্য কোন জিনিস মুখে নিয়ে ইফতার করা সুন্নতের প্রতিকূল। অবশ্য প্রথমে এক ঢোক পানি খেয়ে তারপর ঐ সব খেতে দোষ নেই।

ইফতার করার সময় খাওয়ার মত কোন জিনিস না পাওয়া গেলে মনে মনে ইফতারের নিয়ত করাই যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে আঙ্গুল চোষার প্রয়োজন নেই - যেমন কিছু সাধারণ লোক করে থাকে। যেমন রুমালকে থুথু দিয়ে ভিজিয়ে তা চোষাও বিধেয় নয়।(আশশারহুল মুমতে')

জ্ঞাতব্য যে, অনেক লোকেই এই মাসের ইফতারের সময় বড় লম্বা-চওড়া দস্তরখান বিছিয়ে থাকে। যাতে সাজানো হয় (চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়) নানা রকম পানাহার সামগ্রী। কখনো কখনো সাধ্যের বাইরে নানান ধরনের মাংস, শাক-সব্জি, ফল-মূল, শরবত-জুস ও ক্ষীর-সামাই-পিঠা-পুরি ইত্যাদির সম্ভার প্রস্তুত করা হয়। যার অনেকাংশ প্রয়োজনের অতিরিক্ত; বিধায় তা ফেলে দিতে হয়। যা নিঃসন্দেহে হারাম। রমাযান আমাদের কাছে তা চায় না। তাছাড়া অপচয় শরীয়তে নিষিদ্ধ ও নিন্দিত। মহান আল্লাহ বলেন,

(وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا، إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ)

অর্থাৎ, তোমরা খাও এবং পান কর। আর অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না। *(কুরআনুল কারীম ৭/৩১)*

(وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْراً، إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنَ)

অর্থাৎ, তোমরা কিছুতেই অপব্যয় করো না। কারণ, অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। *(কুরআনুল কারীম ১৭/২৬-২৭)*

বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে আমাদেরকে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করা উচিৎ। উচিৎ নয়, নিষিদ্ধ কৃপণদের পথ অবলম্বন করা। যেমন উচিৎ নয়, অপচয় ও অপব্যয়ের হারাম পথ গ্রহণ করা।(তাওজীহাতুন অফাওয়াএদ লিসসা-য়েমীনা অসসায়েমাত ৩৩-৩৪পৃঃ)

ইফতারের সময়

যেমন পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, সূর্যের পুরো বৃত্ত অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথে ইফতারের সময় হয়। আর সে সময় হল মাগরেবের নামাযের আগে। ইফতার করে নামায পড়ার পর প্রয়োজনীয় আহার ভক্ষণ করবে রোযাদার। অবশ্য যদি আহার প্রস্তুত থাকে, তাহলে প্রথমে আহার খেয়েই নামায পড়বে। যেহেতু আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘‘রাতের খাবার উপস্থিত হলে

মাগরিবের নামায পড়ার আগে তোমরা তা খেয়ে নাও। আর সে খাবার খেতে তাড়াহুড়া করো না।" (বুখারী ৬৭২, মুসলিম ৫৫৭নং)

কিন্তু সময় হওয়ার পূর্বে ইফতার করা হতে সাবধান! কারণ, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) একদল লোককে (স্বপ্নে) দেখলেন যে, তারা তাদের পায়ের গোড়ালির উপর মোটা শিরায় (বাঁধা অবস্থায়) লটকানো আছে, তাদের কশগুলো কেটে ও ছিঁড়ে আছে এবং কশ বেয়ে রক্তও ঝরছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, আমি বললাম, 'ওরা কারা?' তাঁরা বললেন, 'ওরা হল তারা; যারা সময় হওয়ার পূর্বে-পূর্বেই ইফতার করে নিত---।"(

রোযা অবস্থায় দুআ

রোযাদারের উচিৎ, ইফতার করার আগে পর্যন্ত রোযা থাকা অবস্থায় বেশী বেশী করে দুআ করা। কারণ, রোযা থাকা অবস্থায় রোযাদারের দুআ আল্লাহর নিকট মঞ্জুর হয়। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, "তিন ব্যক্তির দুআ অগ্রাহ্য করা হয় না (বরং কবুল করা হয়); পিতার দুআ, রোযাদারের দুআ এবং মুসাফিরের দুআ।"[1] (বাইহাকী ৩/৩৪৫, প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ১৭৯৭নং)

পক্ষান্তরে ইফতার করার সময় দুআ কবুল হওয়ার কথা বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নয়। এ ব্যাপারে যা কিছু বর্ণনা করা হয়, তা যয়ীফ। অনুরূপ ইফতারের সময় একাকী বা জামাআতী হাত তুলে দুআও বিধেয় নয়। কারণ, সুন্নাহ (মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বা তাঁর সাহাবাগণের তরীকায়) এ আমলের বর্ণনা মিলে না। অতএব রোযাদার সতর্ক হন।

এ স্থলে পানাহার করার সময় যে সব দুআ সাধারণভাবে পঠনীয় তা নিম্নরূপঃ-

১। পানাহারের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা। কারণ, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তা বলতে আদেশ করেছেন। (বুখারী ৫৩৭৬, মুসলিম ২০২২নং)

আর তিনি এ কথাও জানিয়েছেন যে, তা না বললে শয়তান ভোজনকারীর সাথে ভোজনে অংশ গ্রহণ করে থাকে।(মুসলিম ২০১৭, আবূ দাঊদ ৩৭৬৬নং)

একদা একটি বালিকা এবং একজন বেদুঈন 'বিসমিল্লাহ' না বলেই খেতে শুরু করতে চাইলে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাদের হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন যে, শয়তান তাদেরকে এভাবে খেতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং তাদের হাতের সাথে

শয়তানের হাত তাঁর হাতে ধরা আছে। আসলে শয়তান তাদের সাথে খেতে চাচ্ছিল। (মুসলিম ২০১৭, আবূ দাঊদ ৩৭৬৬নং)

২। খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে এবং খেতে খেতে মনে পড়লে বলতে হয়,

بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

অর্থ- শুরুতে ও শেষে আল্লাহর নাম নিয়ে খাচ্ছি।(আবূ দাঊদ ৩৭৬৭, তিরমিযী ১৮৫৮, ইবনে মাজাহ ৩২৬৪, ইরওয়াউল গালীল, আলবানী ১৯৬৫নং)

৩। খাওয়া শেষ হলে 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলতে হয়। যেহেতু কিছু খাওয়া অথবা পান করার পরে বান্দা আল্লাহর প্রশংসা করুক এটা তিনি পছন্দ করেন।(মুসলিম ২৭৩৪, আহমাদ, মুসনাদ ৩/১০০, ১১৭, তিরমিযী ১৮১৬নং)

আর ইফতার করার সময় যে দুআ প্রমাণিত, তা ইফতার করার পর পঠনীয়। ইবনে উমার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ইফতার করলে এই দুআ বলতেন,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ ألأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

অর্থ- পিপাসা দূরীভূত হল, শিরা-উপশিরা সতেজ হল এবং ইনশা-আল্লাহ সওয়াব সাব্যস্ত হল।(আবূ দাঊদ ২৩৫৭,সহীহ আবূ দাঊদ ২০৬৬নং)

ইফতারের সময় এই দুআয় সবচেয়ে সহীহরূপে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া ইফতারের অন্যান্য (লাকা সুমতু, ইত্যাদি) দুআ বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত নয়।

রমযানের রোজায় দোয়া ও আমল

রমাদান মাস আল্লাহ তা'আলা এক বিশেষ নিয়ামাত। সাওয়াব অর্জন করার মৌসুম। এ মাসেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, রহমাত, বরকত ও নাজাতের মাস-রমাদান মাস।**আলকুরআনে এসেছে:** ''রমাদান মাস, যার মধ্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে লোকদের পথ প্রদর্শক এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট বর্ণনারূপে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে'' [সূরা আলবাকারাহ : ১৮৫]

রমাদান মাসের ফযিলাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ''রমাদান- বরকতময় মাস তোমাদের দুয়ারে উপস্থিত হয়েছে। পুরো মাস রোযা পালন আল্লাহ তোমাদের জন্য ফরয করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, বন্ধ করে দেয়া হয় জাহান্নামের দরজাগুলো। দুষ্ট শয়তানদের এ মাসে

শৃংখলাবদ্ধ করে দেয়া হয়। এ মাসে আল্লাহ কর্তৃক একটি রাত প্রদত্ত হয়েছে, যা হাজার মাস থেকে উত্তম। যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল, সে বঞ্চিত হল (মহা কল্যাণ হতে)'' [সুনান আত-তিরমিযি: ৬৮৩]

এ মাসে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমল রয়েছে, যেগুলো পালন করার মাধ্যমে আমরা জান্নাতে যেতে পারি, জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারি। নিম্নে রমাদান মাসের আমল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

তবে এ আমলগুলো করার জন্য শর্ত হলো:

এক:- ইখলাস অর্থাৎ ''একনিষ্ঠতার সাথে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যে আমল করা। সুতরাং যে আমল হবে টাকা উপার্জনের জন্য, নেতৃত্ব অর্জনের জন্য ও সুনাম-খ্যাতি অর্জনের জন্যে সে আমলে ইখলাস থাকবে না অর্থাৎ এসব ইবাদাত বা নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে না বরং তা ছোট শির্কে রূপান্তরিত হতে পারে। **আল-কুরআনে এসেছে:** ''আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর 'ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে'' [সূরা আল-বাইয়্যেনাহ : ৫]

দুই:- ইবাদাতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ। সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সকল ইবাদাতের কথা উল্লেখ আছে সেগুলো পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো বাড়ানো বা কমানোর সুযোগ নেই। কারণ, ইবাদাত হচ্ছে তাই যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন। **কুরআনে** এসেছে:'এবং রাসূল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও' [সূরা হাশর: ৭]

এ বিষয়ে **রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ''যে এমন ইবাদত করল যাতে আমাদের কোন নির্দেশনা নেই তা পরিত্যাজ্য হিসাবে গণ্য হবে''। [সহীহ মুসলিম : ৪৫৯০]

রমাদান মাসের গুরুত্বপূর্ণ আমলগুলো হলো:-

[১] সিয়াম পালন করা: ইসলামের পাঁচটি রুকনের একটি রুকন হল সিয়াম। আর রমাদান মাসে সিয়াম পালন করা ফরজ। সেজন্য রমাদান মাসের প্রধান আমল হলো সুন্নাহ মোতাবেক সিয়াম পালন করা। **মহান আল্লাহ** বলেন: ''সুতরাং তোমাদের মধ্যে

যে, মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে” [সূরা আল-বাকারাহ : ১৮৫]

সিয়াম পালনের ফযিলাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ইখলাস নিয়ে অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার জন্য রমাদানে সিয়াম পালন করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে” [সহীহ বুখারী : ২০১৪]

“যে কেউ আল্লাহর রাস্তায় (অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশী করার জন্য) একদিন সিয়াম পালন করবে, তাদ্বারা আল্লাহ তাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে সত্তর বছরের রাস্তা পরিমাণ দূরবর্তীস্থানে রাখবেন”। [সহীহ মুসলিম : ২৭৬৭]

[২] সময় মত সালাত আদায় করা: সিয়াম পালনের সাথে সাথে সময় মত নামায আদায় করার মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম হয়। **কুরআন মাজীদে** বলা হয়েছে: ‘নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয।’ [সূরা নিসা : ১০৩]

এ বিষয়ে **হাদীসে** এসেছে:আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! কোন আমল জান্নাতের অতি নিকটবর্তী? তিনি বললেন, সময় মত নামায আদায় করা। [সহীহ মুসলিম : ২৬৩]

[৩] সহীহভাবে কুরআন শেখা: রমাদান মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ মাসের অন্যতম আমল হলো সহীহভাবে কুরআন শেখা। আর কুরআন শিক্ষা করা ফরয করা হয়েছে। কেননা **কুরআনে** বলা হয়েছে:“পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন” [সূরা আলাক : ১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শেখার নির্দেশ দিয়ে বলেন:“তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তিলাওয়াত কর” [মুসনাদ আলজামি : ৯৮৯০]

[৪] অপরকে কুরআন পড়া শেখানো: রমাদান মাস অপরকে কুরআন শেখানোর উত্তম সময়। এ মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সাহাবীদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। এ বিষয়ে **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়” [সহীহ আল-বুখারী : ৫০২৭]

‘যে আল্লাহর কিতাব থেকে একটি আয়াত শিক্ষা দিবে, যত তিলাওয়াত হবে তার সাওয়াব সে পাবে’ [সহীহ কুনুযুস সুন্নাহ আন-নবুবিয়্যাহ : ০৭]

[৫] সাহরী খাওয়া: সাহরী খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে এবং সিয়াম পালনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। **হাদীসে** এসেছে: ‘‘সাহরী হল বরকতময় খাবার। তাই কখনো সাহরী খাওয়া বাদ দিয়ো না। এক ঢোক পানি পান করে হলেও সাহরী খেয়ে নাও। কেননা সাহরীর খাবার গ্রহণকারীকে আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর ফেরেশতারা স্মরণ করে থাকেন’’ [মুসনাদ আহমাদ : ১১১০১, সহীহ]

[৬] সালাতুত তারাবীহ পড়া: সালাতুত তারাবীহ পড়া এ মাসের অন্যতম আমল। তারাবীহ পড়ার সময় তার হক আদায় করতে হবে। **হাদীসে** এসেছে: ‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াব হাসিলের আশায় রমাদানে কিয়ামু রমাদান (সালাতুত তারাবীহ) আদায় করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে’ [সহীহ আল-বুখারী : ২০০৯]

তারাবীহ এর সালাত তার হক আদায় করে অর্থাৎ ধীরস্থীরভাবে আদায় করতে হবে। তারাবীহ জামায়াতের সাথে আদায় করা সুন্নাহ এর অন্তর্ভুক্ত। **হাদীসে** আছে: ‘‘যে ব্যক্তি ইমামের সাথে প্রস্থান করা অবধি সালাত আদায় করবে (সালাতুত তারাবীহ) তাকে পুরো রাত কিয়ামুল লাইলের সাওয়াব দান করা হবে’’ [সুনান আবূ দাউদ : ১৩৭৭, সহীহ]

[৭] বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা: এটি কুরআনের মাস। তাই এ মাসে অন্যতম কাজ হলো বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা। হাদীসে এসেছে, **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ‘‘যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করে, তাকে একটি নেকি প্রদান করা হয়। প্রতিটি নেকি দশটি নেকির সমান। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ’’ [সুনান আত-তিরমিযী: ২৯১০, সহীহ]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাদান ব্যতীত কোন মাসে এত বেশি তিলাওয়াত করতেন না। **আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা** থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ‘‘রমাদান ব্যতীত অন্য কোনো রাত্রিতে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করতে, কিংবা ভোর অবধি সালাতে কাটিয়ে দিতে অথবা পূর্ণ মাস রোযা পালন করে কাটিয়ে দিতে দেখি নি’’ [সহীহ মুসলিম : ১৭৭৩]

[৮] শুকরিয়া আদায় করা: রমাদান মাস পাওয়া এক বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। সেজন্য আল্লাহ তা‘আলার বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করা এবং আগামী রমাদান পাওয়ার জন্য তাওফীক কামনা করা। রমাদান সম্পর্কে **কুরআনে** বলা হয়েছে: ‘‘আর যাতে

তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর।'' [সূরা আলবাকারাহ : ১৮৫]

''আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, 'যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আজাব বড় কঠিন'।'' [সূরা ইবরাহীম : ৭]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ামাতের শুকরিয়া আদায় করে বলতেন অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য [সুনান আত-তিরমিযী : ২৭৩৮]

[৯] কল্যাণকর কাজ বেশি বেশি করা: এ মাসটিতে একটি ভাল কাজ অন্য মাসের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম। সেজন্য যথাসম্ভব বেশি বেশি ভাল কাজ করতে হবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ''এ মাসের প্রত্যেক রাতে একজন ঘোষণাকারী এ বলে আহবান করতে থাকে যে, হে কল্যাণের অনুসন্ধানকারী তুমি আরো অগ্রসর হও! হে অসৎ কাজের পথিক, তোমরা অন্যায় পথে চলা বন্ধ কর। (তুমি কি জান?) এ মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ তায়ালা কত লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন'' [সুনান আত-তিরমিযী : ৬৮৪]

[১০] সালাতুত তাহাজ্জুদ পড়া: রমাদান মাস ছাড়াও সালাতুত তাহাজ্জুদ পড়ার মধ্যে বিরাট সাওয়াব এবং মর্যাদা রয়েছে। রমাদানের কারণে আরো বেশি ফজিলত রয়েছে। যেহেতু সাহরী খাওয়ার জন্য উঠতে হয় সেজন্য রমাদান মাসে সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায় করার বিশেষ সুযোগও রয়েছে। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ''ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হল রাতের সালাত অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সালাত'' [সহীহ মুসলিম : ২৮১২]

[১১] বেশি বেশি দান-সদাকাহ করা: এ মাসে বেশি বেশি দান-সাদাকাহ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। ইয়াতীম, বিধবা ও গরীব মিসকীনদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ও বেশি বেশি দান খয়রাত করা। হিসাব করে এ মাসে যাকাত দেয়া উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মাসে বেশি বেশি দান খয়রাত করতেন। **আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু** থেকে বর্ণিত: ''রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল আর রমাদানে তাঁর এ দানশীলতা আরো বেড়ে যেত'' [সহীহ আল-বুখারী : ১৯০২]

[১২] উত্তম চরিত্র গঠনের অনুশীলন করা: রমাদান মাস নিজকে গঠনের মাস। এ মাসে এমন প্রশিক্ষণ নিতে হবে যার মাধ্যমে বাকি মাসগুলো এভাবেই পরিচালিত হয়। কাজেই এ সময় আমাদেরকে সুন্দর চরিত্র গঠনের অনুশীলন করতে হবে। **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রোযা রাখে, সে যেন তখন অশস্নীল কাজ ও শোরগোল থেকে বিরত থাকে। রোযা রাখা অবস্থায় কেউ যদি তার সাথে গালাগালি ও মারামারি করতে আসে সে যেন বলে, আমি রোযাদার" [সহীহ মুসলিম : ১১৫১]

[১৩] ই'তিকাফ করা: ই'তিকাফ অর্থ অবস্থান করা। অর্থাৎ মানুষদের থেকে পৃথক হয়ে সালাত, সিয়াম, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া, ইসতিগফার ও অন্যান্য ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে একাকী কিছু সময় যাপন করা। এ ইবাদাতের এত মর্যাদা যে, প্রত্যেক রমাদানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাদানের শেষ দশ দিন নিজে এবং তাঁর সাহাবীগণ ই'তিকাফ করতেন। **আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু** থেকে বর্ণিত: "প্রত্যেক রমাযানেই তিনি শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু জীবনের শেষ রমযানে তিনি ইতিকাফ করেছিলেন বিশ দিন" । দশ দিন ই'তেকাফ করা সুন্নাত। [সহীহ আল-বুখারী : ২০৪৪]

[১৪] দাওয়াতে দ্বীনের কাজ করা: রমাদান মাস হচ্ছে দ্বীনের দাওয়াতের সর্বোত্তম মাস। আর মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকাও উত্তম কাজ। এজন্য এ মাসে মানুষকে দ্বীনের পথে নিয়ে আসার জন্য আলোচনা করা, কুরআন ও হাদীসের দারস প্রদান, বই বিতরণ, কুরআন বিতরণ ইত্যাদি কাজ বেশি বেশি করা। **আলকুরআনের** ঘোষণা : "ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম কথা আর কার হতে পারে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, নেক আমল করলো এবং ঘোষণা করলো, আমি একজন মুসলিম" [সূরা হা-মীম সাজদাহ : ৩৩]
হাদীসে এসেছে:"ভাল কাজের পথ প্রদর্শনকারী এ কাজ সম্পাদনকারী অনুরূপ সাওয়াব পাবে" [সুনান আত-তিরমীযি : ২৬৭০]

[১৫] সামর্থ্য থাকলে উমরা পালন করা: এ মাসে একটি উমরা করলে একটি হাজ্জ আদায়ের সমান সাওয়াব হয়। আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: "রমাদান মাসে উমরা করা আমার সাথে হাজ্জ আদায় করার সমতুল্য" [সহীহ আলবুখারী : ১৮৬৩]

[১৬] লাইলাতুল কদর তালাশ করা: রমাদান মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। **আল-কুরআনের** ঘোষণা: ‘‘কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম’’ [সূরা কদর : ৪]

হাদীসে **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: ‘‘যে ব্যক্তি ঈমান ও সাওয়াব পাওয়ার আশায় ইবাদাত করবে তাকে পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে’’ [সহীহ আল-বুখারী : ৩৫]

এ রাত পাওয়াটা বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। এক হাদীসে **আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা** বলেন: ‘‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য সময়ের তুলনায় রমদানের শেষ দশ দিনে অধিক হারে পরিশ্রম করতেন’’ [সহীহ মুসলিম : ১১৭৫]

লাইলাতুল কদরের দো'আ: আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহর নবী ! যদি আমি লাইলাতুল কদর পেয়ে যাই তবে কি বলব ? **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বললেন, বলবেঃ ‘‘হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালবাসেন, তাই আমাকে ক্ষমা করে দিন।’’ [সুনান আত-তিরমিযী : ৩৫১৩]

[১৭] বেশি বেশি দো'আ ও কান্নাকাটি করা: দো'আ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এজন্য এ মাসে বেশি বেশি দো'আ করা ও আল্লাহর নিকট বেশি বেশি কান্নাকাটি করা। **হাদীসে** এসেছে: ‘‘ইফতারের মূহূর্তে আল্লাহ রাববুল আলামীন বহু লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। মুক্তির এ প্রক্রিয়াটি রমাদানের প্রতি রাতেই চলতে থাকে’’ [আল জামিউস সাগীর : ৩৯৩৩]

অন্য **হাদীসে** এসেছে: ‘‘রমযানের প্রতি দিবসে ও রাতে আল্লাহ তা'আলা অনেককে মুক্ত করে দেন। প্রতি রাতে ও দিবসে প্রতি মুসলিমের দো'আ কবূল করা হয়’’ [সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ১০০২]

[১৮] ইফতার করা: সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করা বিরাট ফজিলাতপূর্ণ আমল। কোন বিলম্ব না করা । **কেননা** হাদীসে এসেছে: ‘‘যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করবে, সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে, খেজুর না পেলে পানি দিয়ে ইফতার করবে। কেননা পানি হলো অধিক পবিত্র ’’ [সুনান আবু দাউদ : ২৩৫৭, সহীহ]

নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** যখন ইফতার করতেন তখন বলতেন : ‘‘পিপাসা নিবারিত হল, শিরা উপশিরা সিক্ত হল এবং আল্লাহর ইচ্ছায় পুরস্কারও নির্ধারিত হল।’’ [সুনান আবূ-দাউদ: ২৩৫৯, সহীহ]

অপর বর্ণনায় যে এসেছে- “হে আল্লাহ! তোমার জন্য রোযা রেখেছি, আর তোমারই রিযিক দ্বারা ইফতার করছি।” এর সনদ দুর্বল। আমাদের উচিত সহীহ হাদীসের উপর আমল করা। [সুনান আবু দাউদ :২৩৫৮]

[১৯] ইফতার করানো: অপরকে ইফতার করানো একটি বিরাট সাওয়াবের কাজ। প্রতিদিন কমপক্ষে একজনকে ইফতার করানোর চেষ্টা করা দরকার। কেননা **হাদীসে** এসেছে: “যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, সে তার সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে, তাদের উভয়ের সাওয়াব হতে বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না” [সুনান ইবন মাজাহ : ১৭৪৬, সহীহ]

[২০] তাওবাহ ও ইস্তেগফার করা: তাওবাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ ফিরে আসা, গুনাহের কাজ আর না করার সিদ্ধান্ত নেয়া। এ মাস তাওবাহ করার উত্তম সময়। আর তাওবাহ করলে আল্লাহ খুশী হন। **আল-কুরআনে** এসেছে: “হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর, খাটি তাওবা; আশা করা যায়, তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত” [সূরা আত-তাহরীম : ৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “হে মানবসকল! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর, আর আমি দিনে তাঁর নিকট একশত বারের বেশি তাওবাহ করে থাকি” [সহীহ মুসলিম : ৭০৩৪]

তবে তাওবাহ ও ইস্তেগফারের জন্য উত্তম হচ্ছে, মন থেকে সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার পড়া, আর তা হচ্ছে “হে আল্লাহ, তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া প্রকৃত এবাদতের যোগ্য কেউ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আর আমি তোমার গোলাম আর আমি সাধ্যমত তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকারের উপর অবিচল রয়েছি। আমার কৃত-কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমাকে যত নেয়ামত দিয়েছে সেগুলোর স্বীকৃতি প্রদান করছি। যত অপরাধ করেছি সেগুলোও স্বীকার করছি। অত:এব, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ, তুমি ছাড়া ক্ষমা করার কেউ নেই।”

ফযিলাত: “যে কেউ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দিনের বেলা এই দু‘আটি (সাইয়েদুল ইসতিগফার) পাঠ করবে ঐ দিন সন্ধ্যা হওয়ার আগে মৃত্যু বরণ করলে সে জান্নাতবাসী হবে এবং যে কেউ ইয়াকিনের সাথে রাত্রিতে পাঠ করবে ঐ রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করলে সে জান্নাতবাসী হবে।” [সহীহ আল-বুখারী : ৬৩০৬]

[২১] তাকওয়া অর্জন করা: তাকওয়া এমন একটি গুণ, যা বান্দাহকে আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় পাপকাজ থেকে বিরত রাখে এবং তাঁর আদেশ মানতে বাধ্য করে। আর রমাদান মাস তাকওয়া নামক গুণটি অর্জন করার এক বিশেষ মৌসুম। **কুরআনে** এসেছে: "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে করে তোমরা এর মাধ্যমে তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো" [সূরা আলবাকারাহ : ১৮৩]

যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। [সূরা তালাক : ০২]

[২২] ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মাসজিদে অবস্থান করা: ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মাসজিদে অবস্থান করা। এটি একটি বিরাট সাওয়াবের কাজ। এ বিষয়ে **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: যে ব্যক্তি ফজর জামাআত আদায় করার পর সূর্য উদয় পর্যন্ত মাসজিদে অবস্থান করবে, অতঃপর দুই রাকাআত সালাত আদায় করবে, সে পরিপূর্ণ হাজ্জ ও উমারাহ করার প্রতিদান পাবে। [সুনান আত-তিরমিযী : ৫৮৬]

[২৩] ফিতরাহ দেয়া: এ মাসে সিয়ামের ত্রুটি-বিচ্যুতি পূরণার্থে ফিতরাহ দেয়া আবশ্যক। **ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু** বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের সালাত আদায়ের পুর্বে ফিতরাহ আদায় করার আদেশ দিলেন। [সহীহ আল-বুখারী :১৫০৩]

[২৪] অপরকে খাদ্য খাওয়ানো: রমাদান মাসে লোকদের খাওয়ানো, বিশেষ করে সিয়াম পালনকারী গরীব, অসহায়কে খাদ্য খাওয়ানো বিরাট সাওয়াবের কাজ। **কুরআনে** এসেছে: তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে। [সূরা আদ-দাহর: ৮]

এ বিষয়ে **হাদীসে** বলা হয়েছে: "আবদুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, একজন লোক এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইসলামে উত্তম কাজ কোনটি? তিনি বললেন, অন্যদেরকে খাবার খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া" [সহীহ আল-বুখারী : ১২]

অপর বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে :"যে কোনো মুমিন কোনো ক্ষুধার্ত মুমিনকে খাওয়াবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। [বাইহাকী, শু'আবুল ইমান : ৩০৯৮, হাসান]

[২৫] আত্মীয়তার সম্পর্ক উন্নীত করা: আত্মীয়তার সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর তা রক্ষা করাও একটি ইবাদাত। এ বিষয়ে **আল্লাহ তা'আলা** বলেন: "আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চাও। আরও তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক। [সূরা আন-নিসা: ১]

আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন:"সালাম বিমিয়ের মাধ্যমে হলেও আত্নীয়তার সম্পর্ক তরতাজা রাখ।" [সহীহ কুনুযুস সুন্নাহ আন-নবওয়িয়্যাহ : ১৩]

[২৬] কুরআন মুখস্থ বা হিফয করা: কুরআন হিফয করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজেই কুরআন হিফযের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি এ দায়িত্ব মূলত বান্দাদেরকে কুরআন হিফয করানোর মাধ্যমেই সম্পাদন করেন। **কুরআনে** এসেছে: "নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হিফাযতকারী" [সূরা আল-হিজর: ৯]

যে যত বেশি অংশ হিফয করতে পারবে তা তার জন্য ততই উত্তম।আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে **রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেন: "কুরআনের ধারক-বাহককে বলা হবে কুরআন পড়ে যাও, আর উপরে উঠতে থাক, ধীর-স্থিরভাবে তারতীলের সাথে পাঠ কর, যেমন দুনিয়াতে তারতীলের সাথে পাঠ করতে। কেননা জান্নাতে তোমার অবস্থান সেখানেই হবে, যেখানে তোমার আয়াত পড়া শেষ হবে" [সুনান আত-তিরমিযী : ২৯১৪]

[২৭] আল্লাহর যিকর করা: এ বিষয়ে **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা চারটি বাক্যকে বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছেন, তাহলো যে ব্যক্তি পড়বে, তার জন্য দশটি সাওয়াব লেখা হয়, আর বিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি পড়বে, তার জন্য বিশটি সাওয়াব লেখা হয়, আর বিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি পড়বে, তার জন্য বিশটি সাওয়াব লেখা হয়, আর বিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে পড়বে, তার জন্য ত্রিশটি সাওয়াব লেখা হয়, আর ত্রিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়"। [মুসনাদ আহমাদ : ১১৩৪৫]

[২৮] মিসওয়াক করা: মেসওয়াকের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। হাদীসে এসেছে: অর্থাৎ মেসওয়াক মুখের জন্য পবিত্রকারী, এবং

রবের সন্তুষ্টি আনয়নকারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রেখেও মেসওয়াক করতেন বলে বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়। [সহীহ ইবন খুযাইমাহ : ১৩৫]

[২৯] একজন অপরজনকে কুরআন শুনানো: রমাদান মাসে একজন অপরজনকে কুরআন শুনানো একটি উত্তম আমল। এটিকে দাওর বলা হয়। **ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু** থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে: জিবরাইল আলাইহিস সালাম রমাদানের প্রতি রাতে রমাদানের শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং রাসূল তাকে কুরআন শোনাতেন। [সহীহ আল-বুখারী : ১৯০২]
ইবনে হাজার রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন : জিবরাইল প্রতি বছর রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করে এক রমযান হতে অন্য রমযান অবধি যা নাযিল হয়েছে, তা শোনাতেন এবং শুনতেন। যে বছর রাসূলের অন্তর্ধান হয়, সে বছর তিনি দু বার শোনান ও শোনেন ।

[৩০] কুরআন বুঝা ও আমল করা: কুরআনের এ মাসে কুরআন বুঝা ও আমল করা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। কুরআন অনুযায়ী নিজের জীবনকে গড়ে তোলা। এ বিষয়ে **কুরআনে** নির্দেশ দেয়া হয়েছে: ‘তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর’। [সূরা আল-আ‘রাফ : ৩]
কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী আবদুল্লাহ **ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু** বলেন: ‘আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কুরআনের দশটি আয়াত শিক্ষা গ্রহণ করতাম, এরপর ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরবর্তী দশটি আয়াত শিক্ষা করতাম না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এই দশ আয়াতের ইলম ও আমল শিখতাম’ [শরহে মুশকিলুল আছার : ১৪৫০]

রোজায় বর্জনীয়

রমাদান মাসের ফজিলত হাসিল করার জন্য এমন কিছু কাজ রয়েছে যা থেকে বিরত থাকা দরকার, সেগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

1. বিলম্বে ইফতার করা
2. সাহরী না খাওয়া
3. শেষের দশ দিন কেনা কাটায় ব্যস্ত থাকা
4. মিথ্যা বলা ও অন্যান্য পাপ কাজ করা
5. অপচয় ও অপব্যয় করা
6. তিলাওয়াতের হক আদায় না করে কুরআন খতম করা

7. জামা'আতের সাথে ফরয সালাত আদায়ে অলসতা করা
8. বেশি বেশি খাওয়া
9. রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদাত করা
10. বেশি বেশি ঘুমানো
11. সংকট তৈরি করা জিনিস পত্রের দাম বৃদ্ধির জন্য
12. অশ্লীল ছবি, নাটক দেখা
13. বেহুদা কাজে রাত জাগরণ করা
14. বিদ'আত করা
15. দুনিয়াবী ব্যস্ততায় মগ্ন থাকা

৭ম অধ্যায়-চিকিৎসা ও আধুনিক প্রসঙ্গ

রোজা অবস্থায় শরীরে কোনো কিছু প্রবেশ করানো রোজার শর্তের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই চিকিৎসা গ্রহণের সময় রোজা ভঙ্গ হয় কি না, তা জানা জরুরি।

১. ইনজেকশন (Injection):

ইনজেকশন দুই প্রকার হয়—

(ক) পুষ্টিদায়ক ইনজেকশন:

যেমন— গ্লুকোজ, স্যালাইন, ভিটামিন ইত্যাদি যা শরীরকে শক্তি জোগায় বা খাদ্যের বিকল্প হিসেবে কাজ করে।

এসব ইনজেকশন রোজা ভঙ্গ করে।

(খ) অপুষ্টিদায়ক ইনজেকশন:

যেমন— ব্যথানাশক, অ্যান্টিবায়োটিক, টিকা ইত্যাদি যা শুধুমাত্র চিকিৎসার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়।

এসব ইনজেকশন রোজা ভঙ্গ করে না।

২. ইনফিউশন (Infusion):

ইনফিউশন হলো তরল পদার্থ ধীরে ধীরে শরীরে প্রবেশ করানো।

যদি তা পুষ্টিদায়ক হয় (স্যালাইন, গ্লুকোজ)রোজা ভঙ্গ হবে।

যদি তা শুধু ওষুধ হয়, পুষ্টি নয় → রোজা ভঙ্গ হবে না।

৩. ইনসুলিন (Insulin):

ইনসুলিন ইনজেকশন ডায়াবেটিস রোগীরা রক্তে চিনি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ব্যবহার করেন।

এটি খাদ্য নয়, চিকিৎসা। তাই রোজা ভঙ্গ করে না।

৪-রোজা রেখে রক্ত দেয়া

রোযা রাখা অবস্থায় রক্ত দেবার দ্বারা রোযার কোন ক্ষতি হয় না। তাই আপনি নিশ্চিন্ত মনে আপনার আত্মীয়কে রক্ত দিতে পারেন। তবে এ পরিমাণ রক্ত বের করা মাকরূহ, যার দ্বারা রোযাদার খুব দুর্বল হয়ে যায়।

عن ثابت البنانى قال: سئل أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف (صحيح البخارى، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيئ للصائم. رقم- 1940(

সাবেত আলবুনানী রাহ. বলেন, আনাস রা. কে জিজ্ঞাসা করা হল রোযার হালতে শিঙ্গা লাগানোকে আপনারা কি মাকরূহ মনে করতেন? তিনি বলেন, 'না। তবে এ কারণে দুর্বল হয়ে পড়লে তা মাকরূহ হবে।'-সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯৪০; সুনানে কোবরা হাদিস ৮৩৪৬; আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৫৬; রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৫

৫-রোজার রেখে ডায়ালাইসিস করা

প্রচলিত ডায়ালাইসিস এর দুই পদ্ধতির মধ্য থেকে কোনটির মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ হবার কারণ পাওয়া যায় না। তাই রোয়া ভঙ্গ বা ক্ষতি হবে না।বাদায়েউস সনায়ে-১/২৪৩.রদ্দুল মুহতার৩/৩৬৯ফাতাওয়ায়ে কসেমীয়া১১/৪৯০.

৬-ইনজেকশন ও ইনস্যুলিন গ্রহণ

ইনজেকশন,ভ্যাকসিন,ইনস্যুলিন ও স্যালাইন নিলে রোজা ভাঙবে না, অবশ্য গ্লুকোজজাতীয় ইনজেকশন অর্থাৎ যেসব স্যালাইন ও ইনজেকশন খাদ্যের কাজ দেয়, রোজা অবস্থায় মারাত্মক অসুস্থতা ছাড়া নেওয়া নাজায়েজ। আলাতে জাদিদা কি শরয়ী আহকাম পৃষ্ঠা ১৫৩ ইবনে আবিদিন -৩/ ৩৬৭; ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান, পৃষ্ঠা ৩২৭

ফাতাওয়ার কিতাবে এসেছে,

وأما ما وصل إلى الجوف أو الى الدماغ عن غير المخارق الأصلية بأن داوى الجائفة ولآمة، فإن داواها بداء يابس لا يفسد (بدائع الصنائع، كتاب الصوم، فصل فى فساد الصوم-) 243\2

৭-ইনহেলার ব্যবহার

সালবিউটামল ও ইনহেলার ব্যবহার করলে রোজা ভেঙে যাবে। শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য ওষুধটি মুখের ভেতরভাগে স্প্রে করা হয়। এতে যে জায়গায় শ্বাসরুদ্ধ হয় সেই জায়গাটি প্রশস্ত হয়ে যায়। ফলে শ্বাস চলাচলে আর কষ্ট থাকে না। উল্লেখ্য, ওষুধটি যদিও স্প্রে করার সময় গ্যাসের মতো দেখা যায়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা দেহবিশিষ্ট তরল ওষুধ। অতএব মুখের অভ্যন্তরে স্প্রে করার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে

হ্যাঁ, মুখে স্প্রে করার পর না গিলে যদি থুতু দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে না। এভাবে কাজ চললে বিষয়টি অতি সহজ হয়ে যাবে। এতে শ্বাসকষ্ট থেকে রেহাই পাওয়ার পাশাপাশি রোজা ভঙ্গ হবে না। ইবনে আবিদিন২/৩৯৫; ফাতাওয়ায়ে ফক্বীহুল মিল্লাত ৫/৪৫৯ হেদায়া ১/১২০

কোনো কোনো চিকিৎসক বলেন, সাহিরতে এক ডোজ ইনহেলার নেওয়ার পর সাধারণত ইফতার পর্যন্ত আর ইনহেলার ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না। তাই এভাবে ইনহেলার ব্যবহার করে রোজা রাখা চাই। হ্যাঁ, কারো যদি বক্ষব্যাধি এমন মারাত্মক আকার ধারণ করে যে ইনহেলার নেওয়া ছাড়া ইফতার পর্যন্ত অপেক্ষা করা দায় হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে এই সুযোগ রয়েছে যে তারা প্রয়োজনভেদে ইনহেলার ব্যবহার করবে ও পরবর্তী সময় রোজা কাজা করে নেবে। আর কাজা করা সম্ভব না হলে ফিদিয়া আদায় করবে। আর যদি ইনহেলারের বিকল্প কোনো ইনজেকশন থাকে, তাহলে তখন ইনজেকশনের মাধ্যমে চিকিৎসা করবে। কেননা রোজা অবস্থায় ইনজেকশন নিলে রোজা ভাঙবে না। ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান, পৃষ্ঠা ৩২৪; সুরা বাকারা : ১৮৪, রদ্দুল মুখতার : ২/৩৯.

৮-হার্টের রোগীদের জন্য

নাইট্রোগি্লসারিন অ্যারোসল জাতীয় এ ওষুধটি হার্টের রোগীরা ব্যবহার করেন। ডাক্তারের মতে, ওষুধটি জিহ্বার নিচে ২-৩ ফোঁটা দেওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে শিরার মাধ্যমে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। এ হিসেবে এ ওষুধ ব্যবহার করার পর গলায় ওষুধ না গেলে বা এর স্বাদ না পৌঁছলে রোজা ভাঙবে না। ফিকহুল নাওয়াজিল ২/২৯৯; ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান।পৃ-৩২৫

৯-অক্সিজেন নেয়া

রোজা অবস্থায় ওষুধ ব্যবহৃত অক্সিজেন ব্যবহার করলে রোজা ভেঙে যাবে। তবে শুধু বাতাসের অক্সিজেন নিলে রোজা ভাঙবে না। কারণ রোজা ভঙ্গের কারণ হচ্ছে, স্বাভাবিক প্রবেশ পথ দিয়ে পেটে বা মস্তিষ্কে খাদ্যদ্রব্য বা ওষুধ প্রবেশ করা। বায়হাকি শরিফ, হাদিস নং-৮৫১২, ফাতহুল বারি-৪/২০৭, জাদিদ ফেকহি; মাসায়েল-১/১৮৮; ইবনে আবিদিন-২/ ২০০ খুলাসাতুল ফাতাওয়া-১/২৫৩.

১০-এন্ডোসকপি

চিকন একটি পাইপ যার মাথায় বাল্ব জাতীয় একটি বস্তু থাকে। পাইপটি পাকস্থলিতে ঢুকানো হয় এবং বাইরে থাকা মনিটরের মাধ্যমে রোগীর পেটের অবস্থা নির্ণয় করা

হয়। এ নলে যদি কোনো ওষুধ ব্যবহার করা হয় বা পাইপের ভেতর দিয়ে পানি/ওষুধ ছিটানো হয়ে থাকে তাহলে রোজা ভেঙে যাবে, আর যদি কোনো ওষুধ লাগানো না থাকে তাহলে রোজা ভাঙবে না। আল বাহরুর রায়েক ২/৪৮৭, আলমুহিতুল বোরহানি ৩/৩৪৮, জাদিদ ফিকহী মাসায়েল ১/১২৬

১১-এনজিওগ্রাম

হার্ট ব্লক হয়ে গেলে উরুর গোড়া কেটে বিশেষ রগের ভেতর দিয়ে হার্ট পর্যন্ত যে ক্যাথেটার ঢুকিয়ে পরীক্ষা করা হয় তার নাম এনজিওগ্রাম। এ যন্ত্রটিতে যদি কোনো ধরণের ঔষধ লাগানো থাকে তারপরও রোজা ভাঙবে না। আল-মালাকাতুল ফিকহিয়া-১/১২৪.

১২-রোজা অবস্থায় চোখে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার

চোখে ড্রপ, ওষুধ, সুরমা, মলম ইত্যাদি ব্যবহার করলে রোজা নষ্ট হবে না। যদিও এগুলোর স্বাদ গলায় উপলব্ধি হয়। কারণ চোখে ওষুধ ইত্যাদি দিলে রোজা না ভাঙার বিষয়টি হাদিস ও ফিকাহশাস্ত্রের মূলনীতি দ্বারা প্রমাণিত। জাদিদ ফিকহি মাসায়িল - ১/১৮৩; আল-ফাতাওয়া তাতারখানিয়া-২/৩

১৩.লেপারোস্কপি((Laparoscopy): শিক্ জাতীয় একটি যন্ত্র দ্বারা পেট ছিদ্র করে পেটের ভিতরের কোন অংশ বা গোশত ইত্যাদি পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বের করে নিয়ে আসার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র। এতে যদি ঔষধ লাগানো থাকে তাহলে রোজা ভেঙ্গে যাবে অন্যস্থায় রোজা ভাঙ্গেব না। (আল মাকালাতুল ফিকহীয়া)

১৪.প্রক্টোস্কপি(proctoscopy): পাইলস, পিসার, অর্শ, হারিশ, বুটি ও ফিস্টুলা ইত্যাদি রোগের পরীক্ষাকে প্রক্টোসকপি বলে। মলদ্বার দিয়ে নলপ্রবেশ করিয়ে পরীক্ষাটি করা হয়। রোগী যাতে ব্যথা না পায় সে জন্য নলের মধ্যে গিøসারিন জাতীয় কোন পিচ্ছিল বস্তু ব্যবহার করা হয়। নলটি পুরোপুরি ভিতরে প্রবেশ করে না। চিকিৎসকদের মতানুসারেঐ পিচ্ছিল বস্তুটি নলের সাথে মিশে থাকে এবং নলের সাথেই বেরিয়ে আসে, ভেতরে থাকে না। আর থাকলেও তা পরবর্তীতে বেরিয়ে আসে। যদিও শরীর তা চোষে না কিন্তু ঐ বস্তুটি ভিজা হওয়ার কারণে রোজা ভেঙ্গে যাবে।(ফতওয়া শামী)

১৫. কপার-টি (Coper-T): কপার-টি বলা হয় যোনিদ্বারে প্লাস্টিক লাগানোকে,যেন সহবাসের সময় বীর্যপাত হলে বীর্য জরায়ুতে পৌঁছাতে না পারে।এ কপার-টি লাগিয়েও সহবাস করলে রোজা ভেঙ্গে যাবে। কাযা কাফফারা উভয়টাই ওয়াজিব হবে।

১৬. সিরোদকার অপারেশন (Shirodkar Operation): সিরোদকার অপারেশন হল অকাল গর্ভপাত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে জরায়ুর মুখের চতুষ্পার্শ্বে সেলাই করে মুখকে খিচিয়ে রাখা। এতে অকাল গর্ভপাত রোধ হয়। যেহেতু এতে কোন ঔষধ বা বস্তু রোজা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য খালি স্থানে পৌঁছে না তাই এর দ্বারা রোজা ভাঙ্গবে না।

১৭.ডি এন্ড সি (Dilatation and Curettage): ডি এন্ড সি হল গর্ভধারণের আট থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যে উরষধঃড়ৎ এর মাধ্যমে জীবিত কিংবা মৃত বাচ্চাকে মায়ের গর্ভ থেকে বের করে নিয়ে আসা। এতে রোজা ভেঙ্গে যাবে। অযথা এমন করলে কাযা কাফফারা উভয়টি দিতে হবে এবং তওবা করতে হবে।(হেদায়া)

১৮.এম আর (M.R):

এম আর হল গর্ভ ধারণের পাঁচ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে যোনিদ্বার দিয়ে জরায়ুতে এম আর সিরিঞ্জ প্রবেশ করিয়ে জীবিত কিংবা মৃত ভ্রূণ নিয়ে আসা। যার পর ঋতু্রাব পুণরায় হয়। অতএব মাসিক শুরু হওয়ার কারণে রোজা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা করতে হবে। কিন্তু যদি রাতের বেলা করা হয় তাহলে দিনের রোজা কাযা করতে হবে না। (ফতহুল কাদীর)

১৯.আলট্রাসনোগ্রাম(Ultrasongram):

আলট্রাসনোগ্রাম পরীক্ষায় যে ঔষধ বা যন্ত্র ব্যবহার করা হয় সবই চামড়ার উপরে থাকে, তাই আলট্রাসনোগ্রাম করলে রোজা ভাঙ্গবে না। (হেদায়া)

২০.টিকানেয়া(Vaccine):

টিকা নিলে রোজা ভাঙ্গবে না। কারণ, টিকা রোজা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তায় ব্যবহার করা হয় না। (আপকে মাসায়েল)

২১.ঢুস(Douche):

ঢুস মলদ্বারের মাধ্যমে দেহের ভিতরে প্রবেশ করে, তাই ঢুস নিলে রোজা ভেঙ্গে যাবে। ঢুস যে জায়গা বা রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে এ জায়গা বা রাস্তা রোজা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য স্থান । (ফতওয়ায়ে শামী)

২২.ডায়াবেটিস পরীক্ষা:

ডায়াবেটিসের সুগার মাপার জন্য সুঁচ ঢুকিয়ে যে একফোঁটা রক্ত নেয়া হয়, এতে রোজার কোন ক্ষতি হবে না।

২৩.নাকে ঔষধ দেয়া:

নাকে পানি বা ঔষধ দিলে যদি তা খাদ্যনালীতে চলে যায়, তাহলে রোজা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা করতে হবে। (ফতওয়ায়ে রাহমানিয়া)

২৪.কানে ঔষধ প্রদান করা:

কানে ঔষধ, তেল ইত্যাদি ঢুকালে রোজা ভেঙ্গে যাবে। তবে গোসল করার সময় অনিচ্ছায় যে পানি কানে ঢুকে তাতে রোজা ভঙ্গ হবে না। অবশ্য এক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে, যেন পানি গলায় না চলে যায়। (আল মাকালাতুল ফিকহীয়া)

২৫.নকল দাঁত মুখে রাখা:

রোজা রেখে নকল দাঁত মুখে স্থাপন করে রাখলে রোজার কোন ক্ষতি হয় না। (ইমদাদুল ফতওয়া)

২৬.দাঁত তোলা:

রোজা অবস্থায় একান্ত প্রয়োজন হলে দাঁত তোলা জায়েজ আছে। তবে অতি প্রয়োজন না হলে এমনটা করা মাকরূহ। ঔষধ যদি গলায় চলে যায় অথবা থুথু থেকে বেশি অথবা সমপরিমাণ রক্ত যদি গলায় যায় তাহলে রোজা ভেঙ্গে যাবে। (আহসানুল ফতওয়া)

২৭. মস্তিষ্ক অপারেশন:

রোজা অবস্থায় মস্তিষ্ক অপারেশন করলে রোজা ভঙ্গ হবে না। যদিও মস্তিষ্কে কোন তরল কিংবা শক্ত ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কেননা, মস্তিষ্ক থেকে গলা পর্যন্ত সরাসরি কোন ছিদ্র ও পথ নেই। তাই মস্তিষ্কে কোন কিছু দিলে তা গলায় পৌঁছে না। পূর্ব যুগে ছিদ্র ও পথ আছে ধারণা করেই এতে রোজা ভেঙ্গে যাওয়ার কথা বিভিন্ন কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে।

আধুনিক ভ্রমণ ও বিমানযাত্রা

বিমানে ভ্রমণকারীর করণীয়

বিমানে ভ্রমণরত অবস্থায় সূর্যাস্ত ও ফজরের ওয়াক্তের সূচনা বিমান থেকে দেখে নির্ণয় করতে হবে, এ ক্ষেত্রে বিমান যে দেশের ওপর দিয়ে অতিক্রম করছে, সেই দেশের সময়সূচীর অনুসরণ করা যাবে না। কেননা শরিয়তে রোজার শুরুকে ফজরের শুরু এবং রোজার সমাপ্তিকে সূর্যাস্তের (অর্থাৎ সূর্যগোলক সম্পূর্ণ অদৃশ্য হওয়ার) সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, আর তা হবে প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থান অনুযায়ী।

কোনো কারণে তা সম্ভব না হলে সাধ্যমতো আন্দাজ করে রোজার শুরু ও শেষ করবে। কেননা এক্ষেত্রে এছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

মাসয়ালা: বিমানে ভ্রমণকারী ভূমিতে থাকা অবস্থায় সূর্যাস্তের সময় অনুযায়ী ইফতার করল, এরপর বিমান আকাশে ওড়ার পর সূর্য দেখা গেল, এক্ষেত্রে তাকে পানাহার থেকে বিরত হতে হবে না, কেননা তার রোজা শরিয়তসম্মতভাবে পূর্ণ হয়েছে। -শরহে উমদাতুল ফিকহ: ৫৬৪

মাসয়ালা: তেমনই নিজ দেশে ইফতার করার পর ওই দিন থাকতেই কেউ যদি অন্য দেশে পৌঁছে যায় এবং সেই দেশে দিবাভাগ বিরাজ করে, তবে পানাহার থেকে বিরত থাকার প্রয়োজন নেই এবং রোজা পূর্ণ হয়েছে বলে ধরা হবে। -প্রাগুক্ত

কিন্তু যদি সূর্যাস্তের পূর্বেই প্লেন আকাশে ওড়ে আর এর ফলে দিনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় তবে সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত রোজা পালন করে যেতে হবে।

এ সব মাসয়ালার সপক্ষে দলিল হলো, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন রাত এখান (পূর্বদিক) থেকে আগমন করে ও দিন এখান (পশ্চিমদিক) থেকে পশ্চাত গমন করে এবং সূর্যাস্ত যায়, তাহলে সওম পালনকারী ইফতার হল।'- সহিহ বোখারি ও মুসলিম

রোজা অবস্থায় ভিন্ন দেশে গমনের ফলে সময়ের তারতম্য হলে

মাসয়ালা: একস্থানে রোজা শুরু করে অন্যস্থানে যাওয়ায় রোজা কম-বেশি হলে ধরে নেওয়া যাক, কোনো ব্যক্তি জাপানে রোজা শুরু করল সেদেশে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে এবং ১৫ রমজান সে সৌদি গিয়ে দেখল ওই দিন ১৭/১৮ রমজান। লোকটি যেদিন সৌদিবাসীর সঙ্গে ঈদ করল তার আগের দিন পর্যন্ত রোজা হয়েছে ২৭ বা ২৮টি। এখন তার করণীয় কী? এমনিভাবে উদাহরণস্বরূপ, সাউথ আফ্রিকায় রোজা শুরু করে কেউ ইন্দোনেশিয়া চলে গেলে তার রোজা ৩০টি পুরো হওয়ার পরও ইন্দোনেশিয়াবাসীদের সে হয়তো আরো ২টি বা ১টি রোজা রাখতে দেখতে পারে। এক্ষেত্রে লোকটি কত দিন রোজা রাখবে? অর্থাৎ এক দেশে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে রোজা শুরু করে অন্য দেশে গিয়ে তা সমাপ্ত করলে ওই দেশের চাঁদের হিসাবে রোজার সংখ্যা কমে বা বেড়ে গেলে তখন ওই রোজাদার ব্যক্তির করণীয় কী?

এ প্রশ্নের জবাবের আগে একটি বিষয় জেনে রাখা দরকার যে, চান্দ্রমাসের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়কাল হলো যথাক্রমে ২৯ ও ৩০ দিন। হাদিসে রাসূলে কারিম (সা.) সুস্পষ্টভাবে এ ঘোষণা দিয়েছেন। এরই আলোকে সমস্যাটির সমাধান হলো- যে ব্যক্তি ২৭ বা ২৮ রোজা পূর্ণ করার পরই তার (সফর করে আসা) দেশে ঈদের চাঁদ ওঠে যায় সে ওই দেশবাসীর সঙ্গে ঈদ করবে এবং পরবর্তী সময়ে একটি বা দু'টি রোজা রেখে ৩০টি পূর্ণ করবে। তবে ওই জায়গায় যদি ২৯ রোজার পরই ঈদের চাঁদ দেখা গিয়ে থাকে তাহলে ২৯টি পুরো করলেই চলবে। আর যে ব্যক্তির রোজা ৩০টি পুরো হয়ে যাওয়ার পরও ওই দেশের মুসলমানদের রমজান মাস পূর্ণ হয় না সে ওই দেশের লোকজনের সঙ্গে রমজান শেষ হওয়া পর্যন্ত রোজা রেখে যাবে। যাতে রমযানের পবিত্রতা ক্ষুন্ন না হয়। অতপর সকলের সঙ্গে একত্রে ঈদ করবে। আরেকটু বিশদভাবে বললে, কোনো ব্যক্তি রমজান মাসে উমরা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে গেছে। বাংলাদেশ হিসাবে তার ২৮ রোজা পূর্ণ হতেই সেখানে ঈদের চাঁদ দেখা গেছে। এই ব্যক্তি সৌদি আরবের লোকের সাথেই ঈদ করবে, ওই দিন সে রোজা রাখবে না। পরবর্তীতে সে একটা রোজা কাজা করে নিবে যদি বাংলাদেশে ঊনত্রিশে রোজা হয়ে থাকে আর যদি ত্রিশে রোজা হয়ে থাকে তাহলে দু'টো রোজা কাজা করে নিবে।
অনুরূপ কোনো ব্যক্তি রমজান মাসে সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশে এসেছে। সৌদি আরবের হিসাবে তার রোজা ৩০টি পূর্ণ হলেও বাংলাদেশে এখনো চাঁদ দেখা যায়নি। সে বাংলাদেশী মানুষের সাথেই ঈদ পালন করবে যদিও তার রোজা ৩১টি হয়। -নাসাঈ শরিফ, হাদিস নং ২১১৮, ফতোয়ায়ে আলমগীরী: ১/১৯৯

৪.২ মহাকাশে রোযা

মিডিয়া ও প্রযুক্তির প্রভাব

আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সহজ করেছে এবং রমজান মাসেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষ করে স্মার্ট গ্যাজেট ও বিভিন্ন অ্যাপস রোজা রাখা ও ইবাদত পালনে সহায়ক হতে পারে। রমজান মাসে মুসলমানদের ইবাদত পালনে সহযোগী হতে পারে এমন কিছু অ্যাপস আছে।

স্মার্ট আজান ক্লক

নামাজের সময় মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য স্মার্ট আজান ক্লক অত্যন্ত কার্যকর। এটি নামাজের নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী আজান দেয় এবং নামাজের সময়সূচি মনে করিয়ে

দেয়। এর মধ্যে রয়েছে এলইডি ডিসপ্লে, কিবলার দিকনির্দেশনা এবং বিভিন্ন ইসলামিক ক্যালেন্ডারের তথ্য।

মাইরোজা অ্যাপ

রমজান মাসে রোজার সময় ও ইফতারের সঠিক সময় জানতে মাইরোজা অ্যাপ অত্যন্ত সহায়ক। এটি রোজার সময়সূচি, নামাজের সময়, দোয়া ও ইফতারের জন্য উপযুক্ত খাবারের তালিকা প্রদান করে। এ ছাড়া রোজা রাখার স্বাস্থ্যকর উপায় সম্পর্কেও পরামর্শ দেয়।

ইয়াসমিনা মিদি

ইয়াসমিনা একটি আরবি ভাষার এআই সহকারী অ্যাপ। এতে প্রার্থনার সময়ের রিমাইন্ডার, পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত ও হাদিসের ব্যাখ্যা শোনার ফিচার রয়েছে। এ ছাড়া এটি ইফতারের প্রস্তুতির জন্য সুস্বাদু রেসিপির সন্ধান দেবে। এর বিশেষ ফিচারের মাধ্যমে জানা যাবে, রোজা রাখার সময় কোন খাবার খাওয়া উচিত। এর মাধ্যমে সহজে রমজান মাসে স্বাস্থ্যকর ও উপকারী খাবারের সন্ধান পেতে পারেন।

কোরআন এমপি৩ প্লেয়ার

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের জন্য কোরআন এমপি৩ প্লেয়ার জনপ্রিয় একটি গ্যাজেট। এটি কোরআন পাঠ করার পাশাপাশি অর্থ ও তাফসির শোনার সুযোগ দেয়। এতে রয়েছে বহুল পরিচিত কারিদের কণ্ঠে তেলাওয়াতের অপশন, যা ইবাদতে আরও মনোযোগী হতে সাহায্য করে।

ইসলামিক কম্পাস অ্যাপ

যারা ভ্রমণ করেন বা অফিসে দীর্ঘসময় কাটান, তাদের জন্য ইসলামিক কম্পাস অ্যাপ অত্যন্ত উপকারী। এটি কিবলার দিকনির্দেশনা দেয় এবং নামাজের সময় নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।

স্মার্ট তসবিহ

জিকিরের জন্য স্মার্ট তসবিহ রমজান মাসে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এটি একটি ডিজিটাল ডিভাইস, যা ব্যবহারকারীকে নির্দিষ্টসংখ্যক জিকির গণনার সুবিধা দেয়। এতে থাকা ভাইব্রেশন অ্যালার্ট ফিচার ব্যবহারকারীকে নির্ধারিত সংখ্যক জিকির সম্পন্ন হওয়ার সংকেত দেয়।

ডিজিটাল আজান টেবিল ঘড়ি

নামাজের সময় মনে করিয়ে দেয় এ ধরনের ঘড়ি। এই ঘড়িতে ডিজিটাল স্ক্রিন বা এলইডি ডিসপ্লে ব্যবহার করে আজান ও নামাজের সময় সেট করা থাকে। এতে রয়েছে আজান শোনার ফিচার, নামাজের সময়ের অ্যালার্ম, স্থানীয় সময়ের জন্য নির্দিষ্ট সেটিংস, ইসলামিক ক্যালেন্ডার, রমজান মাসের সেহরি ও ইফতারের সময়।

কোরআন অ্যাপস

পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত রমজান মাসে মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এখন বিভিন্ন কোরআন অ্যাপস পাওয়া যায়, যেগুলো আপনাকে যেকোনো জায়গা থেকে কোরআন পড়তে বা শুনতে সাহায্য করবে। এসব অ্যাপসে কোরআনের অডিও, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রয়েছে।

জবিহাহ্‌ অ্যাপ

রমজান মাসে ভ্রমণের সময় হালাল খাবার খোঁজ করা অনেকের জন্য কঠিন হয়ে যায়। জবিহাহ্‌ অ্যাপটি আশপাশের হালাল রেস্টুরেন্ট ও বাজার খুঁজতে সাহায্য করবে। এটি আপনার অবস্থানের আশপাশে কোথায় হালাল খাবার পাওয়া যাবে, তা জানিয়ে দেবে।

জিকির রিং

জিকির রিং নতুন ডিজিটাল গ্যাজেট। এটি রমজান মাসের জন্য বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই ছোট রিং আকারের ডিভাইসের মাধ্যমে ব্যবহারকারী যেকোনো জায়গায়, যেকোনো সময় জিকির করতে পারেন।

ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি আমাদের অনেক নতুন সুযোগ-সুবিধা এনে দিয়েছে। রমজান মাসে এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে রোজা, প্রার্থনা ও অন্যান্য ইবাদতে আরও বেশি মনোযোগী হওয়া যায়। এসব প্রযুক্তিনির্ভর গ্যাজেট সময়ের হিসাব এবং বিশেষ সময়ে শরীর ফিট রাখতে সাহায্য করে। ফলে ভালোভাবে ধর্মীয় কাজগুলো করা সম্ভব হয়।

হেলদি ফাস্টিং অ্যাপ

রমজান মাসে সুস্থ থাকার জন্য হেলদি ফাস্টিং অ্যাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এটি রোজা রাখার উপযোগী খাবারের তালিকা দেয়, শরীরের পানিশূন্যতা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে এবং স্বাস্থ্যকর ইফতার ও সেহরির পরামর্শ দেয়।

হালাল ফাইন্ডার অ্যাপ

অনেক সময় ভ্রমণের কারণে হালাল খাবার খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়। হালাল ফাইন্ডার অ্যাপ ব্যবহারকারীর অবস্থান অনুযায়ী নিকটস্থ হালাল রেস্টুরেন্ট ও বাজার খুঁজে

দেয়, যা রমজানে সুস্থভাবে রোজা রাখতে সহায়ক। প্রযুক্তির উন্নতির ফলে রমজান মাসে ইবাদত করা আগের চেয়ে আরও সহজ ও সুবিধাজনক হয়েছে। এসব স্মার্ট গ্যাজেট ও অ্যাপ ব্যবহার করে মুসলমানরা আরও সংগঠিতভাবে রোজা পালন করতে পারেন এবং ইবাদতে মনোযোগী হতে পারেন।

উপসংহার ও সুপারিশ

গবেষণার সারসংক্ষেপ:

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম হলো রোজা। এটি এমন এক ইবাদত যা মুসলমানের আত্মসংযম, তাকওয়া অর্জন ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মানুষকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত করে। রোজা শুধু খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকার নাম নয়; বরং এটি এক সামগ্রিক আত্মিক অনুশীলন যা মানুষের অন্তর, চিন্তা ও আচরণকে পরিশুদ্ধ করে।

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো— ইসলামী শরিয়তের আলোকে রোজার গুরুত্ব, উদ্দেশ্য ও বিধান বিশ্লেষণ করা; রোজার সামাজিক, মানসিক ও চিকিৎসাগত প্রভাব পর্যালোচনা করা; এবং আধুনিক যুগে রোজা পালনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও প্রয়োগিক দিক অনুধাবন করা।

গবেষণায় কুরআন ও হাদীসের দলিল, ইসলামী গবেষকদের মতামত, চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রমাণভিত্তিক তথ্য এবং সমাজবিজ্ঞানীয় বিশ্লেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। ফলাফল নির্দেশ করে যে, রোজা মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, সমাজে সহানুভূতি ও সমতার পরিবেশ সৃষ্টি করে, এবং শারীরিকভাবে দেহকে পরিশুদ্ধ রাখে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণাও দেখায় যে, রোজা শরীরের হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে, ইনসুলিন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং মানসিক প্রশান্তি এনে দেয়।

অতএব, রোজা শুধু ধর্মীয় ইবাদত নয়; এটি মানবজীবনের এক পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ যা আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও শারীরিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করে। এই গবেষণা প্রমাণ করে

যে রোজা মানবতার জন্য এক সার্বজনীন কল্যাণকর বিধান, যা আজকের প্রযুক্তিনির্ভর জীবনে আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ

শিক্ষা

১. রোজা মানুষকে আত্মসংযম ও ধৈর্য শেখায়।
২. এটি আল্লাহভীতি (তাকওয়া) অর্জনের অন্যতম মাধ্যম।
৩. রোজা সমাজে সমতা, সহানুভূতি ও দানশীলতার মানসিকতা গড়ে তোলে।
৪. এটি শরীর ও আত্মা উভয়ের পরিশুদ্ধি ঘটায়।
৫. রোজার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর আদেশ পালনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন সাধন করে।
৬. রোজা মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে।
৭. এটি মানুষকে সময়ানুবর্তী, সৎ, সহনশীল ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের দিকে পরিচালিত করে।

বাস্তব প্রয়োগ

১. ব্যক্তিজীবনে রোজার শিক্ষা বাস্তবায়ন করলে মানুষ লোভ, ক্রোধ ও অন্যায়ের পথ থেকে বিরত থাকতে পারে।
২. পরিবারে রোজার শিক্ষা প্রয়োগ করলে পারস্পরিক ভালোবাসা, সম্মান ও ধৈর্য বৃদ্ধি পায়।
৩. সমাজে রোজার চেতনা অনুসারে দরিদ্রদের সাহায্য, জাকাত ও সদকার প্রচলন বৃদ্ধি পায়, যা দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখে।
৪. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রোজার নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়িত হলে দুর্নীতি, অন্যায় ও অপচয় কমে আসবে।
৫. শিক্ষার্থীরা রোজার শিক্ষা থেকে শৃঙ্খলা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের চর্চা করতে পারে, যা তাদের জীবনে সাফল্যের ভিত্তি স্থাপন করে।
৬. রোজার মাধ্যমে অর্জিত তাকওয়া ও নৈতিকতা দৈনন্দিন জীবন ও পেশাগত কর্মকাণ্ডে সততা ও দায়িত্ববোধ বাড়াতে সাহায্য করে।

৭. রোজার শিক্ষা সমাজে ন্যায়পরায়ণ, সহানুভূতিশীল ও মানবিক মানুষ গড়ে তুলতে সহায়ক হয়।

ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা

রোজা ইসলামের একটি মৌলিক বিধান এবং এটি কেবল ইবাদতের সীমারেখায় আবদ্ধ নয়; বরং এটি মানুষের জীবন, সমাজ, নৈতিকতা, অর্থনীতি ও স্বাস্থ্য—সব ক্ষেত্রেই গভীর প্রভাব ফেলে। তাই রোজা সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত ও সম্ভাবনাময়। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে গভীর অনুসন্ধান চালানো যেতে পারে। নিচে রোজা বিষয়ক গবেষণার কয়েকটি সম্ভাব্য দিকনির্দেশনা উল্লেখ করা হলো—

১. রোজা ও শারীরিক স্বাস্থ্য

রোজার স্বাস্থ্যগত উপকারিতা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। ভবিষ্যৎ গবেষণায় রোজার ফলে শরীরের বিপাক প্রক্রিয়া, ইনসুলিনের ভারসাম্য, হজমব্যবস্থা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর প্রভাব আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন বয়স, পেশা ও স্বাস্থ্য অবস্থার মানুষের ক্ষেত্রে রোজার প্রভাব তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

২. রোজা ও মানসিক স্বাস্থ্য

রোজা আত্মনিয়ন্ত্রণ, ধৈর্য ও মানসিক প্রশান্তি সৃষ্টি করে—এটি সুপরিচিত সত্য। ভবিষ্যৎ গবেষণায় মানসিক রোগ, উদ্বেগ, বিষণ্নতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে রোজার ভূমিকা মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। রোজা কিভাবে ব্যক্তিকে ইতিবাচক চিন্তা, আত্মতুষ্টি ও অন্তর্গত শান্তি প্রদান করে—এ বিষয়ে নতুন গবেষণা ক্ষেত্র উন্মুক্ত।

৩. রোজা ও সামাজিক পরিবর্তন

রোজা সমাজে সহমর্মিতা, দানশীলতা ও নৈতিক উন্নয়ন ঘটায়। ভবিষ্যৎ গবেষণায় দেখা যেতে পারে রমজান মাসে সমাজে অপরাধ প্রবণতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক সংহতির হার কেমন পরিবর্তিত হয়। সমাজবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্বের

সমন্বয়ে রোজার সামাজিক প্রভাব নিয়ে একটি আন্তঃবিভাগীয় গবেষণা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে।

৪. রোজা ও অর্থনৈতিক প্রভাব

রোজা মানুষের ভোগবিলাস কমিয়ে সংযমী জীবনযাপন শেখায়। এই শিক্ষা সমাজে সঞ্চয়, ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য গঠনে ভূমিকা রাখে। ভবিষ্যৎ গবেষণায় রমজান মাসে বাজারে ভোগ প্রবণতা, মূল্যবৃদ্ধি, ব্যবসায়িক নৈতিকতা ও শ্রম উৎপাদনশীলতার ওপর রোজার প্রভাব বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

৫. রোজা ও শিক্ষা

রোজা শিক্ষার্থীদের মনোযোগ, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও অধ্যবসায় বৃদ্ধি করে। গবেষকরা ভবিষ্যতে রোজার সময় শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত সাফল্য, মনোযোগের স্থায়িত্ব ও নৈতিক আচরণের পরিবর্তন নিয়ে পর্যালোচনা করতে পারেন। এর মাধ্যমে রোজাকে নৈতিক শিক্ষার অংশ হিসেবে পাঠ্যক্রমে সংযোজনের সম্ভাবনাও অন্বেষণ করা যেতে পারে।

৬. রোজা ও পরিবেশ সচেতনতা

রোজা মানুষকে অপচয় বর্জন ও সংযমী জীবনযাপনের শিক্ষা দেয়। ভবিষ্যতে গবেষণার মাধ্যমে দেখা যেতে পারে, রোজার এই শিক্ষা কীভাবে টেকসই জীবনধারা ও পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, খাদ্য অপচয় রোধ, বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে রোজার নৈতিক বার্তা কীভাবে কার্যকর হতে পারে তা অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

৭. আন্তঃধর্মীয় উপবাস তুলনামূলক গবেষণা

বিভিন্ন ধর্মে উপবাস বা ফাস্টিং-এর প্রচলন রয়েছে। ইসলামি রোজা ও অন্যান্য ধর্মের উপবাস প্রথার তুলনামূলক গবেষণা করলে মানবসভ্যতার আধ্যাত্মিক অভিন্নতা ও নৈতিক দর্শনের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। এই গবেষণা ধর্মীয় সহনশীলতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়াকে আরও গভীর করতে পারে।

৮.রোজা ও রাষ্ট্রীয় নীতি

রোজার শিক্ষা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রয়োগ করা গেলে দুর্নীতি, অপচয় ও অন্যায় কমানো সম্ভব। ভবিষ্যতে প্রশাসন, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক নীতিতে রোজার নৈতিকতা কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে—তা নিয়েও নীতিনির্ধারণমূলক গবেষণা করা যেতে পারে।

উপসংহার

সর্বোপরি, রোজা এমন একটি ইবাদত যা ব্যক্তিগত, সামাজিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। তাই ভবিষ্যৎ গবেষকরা যদি ধর্মতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সমন্বয়ে রোজা নিয়ে আন্তঃবিভাগীয় গবেষণা পরিচালনা করেন, তবে ইসলামী ইবাদতের বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য আরও স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

রোজা বিষয়ক এই গবেষণা মুসলমানদের নৈতিক পুনর্জাগরণ ও মানবকল্যাণে দিকনির্দেশক ভূমিকা পালন করবে, ইনশাআল্লাহ।